তৃতীয় বর্ষ

বাউল ফকির উৎসব

সহজ ধারা সঙ্গ কর

৫ ও ৬ জানুয়ারী ২০০৮

নবনগর - বিবেকানন্দ ময়দান, (শক্তিগড়), যাদবপুর

সম্পাদকীয়

নেই নেই করে **বাউল ফকির উৎসব** তিন বছরে পা দিল। প্রথম যখন কিছু বাউল-ফকির সঙ্গীত শ্রেমীদের নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন হয়-তখন ছিল এক অন্য রোমাঞ্চ আর হৈ চৈ- মানে উৎসব উদ্যোক্তাদের আর কি। ক্রমশঃ জুটে গিয়েছেন আরো অনেক মানুষজন আর বাউল ফকিররা তো বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন মেলা , উৎসব, আখড়ায় সাক্ষাত ছাড়াও মোবাই(উ)ল যোগাযোগে - কবে হচ্ছে এবার, কে কে আসছে, ক্ষেপী কে এবার কিন্তুনিয়ে যাব- এরকম কথাবার্তা ক্রমশঃ উৎসব হবে কি হবে নার দোলাচল থেকে অবশেষে হচ্ছেই এরকম সিদ্ধান্ত হল, তখন যথারীতি শিরে সংক্রান্তি।

আসলে **মারফৎ** তো এই উৎসবের নিমিত্ত মাত্র। স্থানিয় মানুষজন আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধুবর্গ যারা এই গান আর সঙ্গ নিয়ে মশগুল তাদের ছাড়া উৎসবের চিন্তা আমাদের কাছে একেবারেই অবাস্তব প্রস্তাব। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নবনগর কলোনি কমিটি, যাদের ভালোবাসায় গড়ে ওঠা বিবেকানন্দ ময়দান দুদিনের এই উৎসব ঘিরে হয়ে ওঠে এক মেলা প্রাঙ্গন।

এ এক অদ্ভুদ আবিষ্কার-শহরের সঙ্গে গ্রাম সংস্কৃতির মেলবন্ধন একে বলা যায় কি না ঠিক জানা নেই তবে এই উৎসব ঘিরে মানুষে মানুষে যোগাযোগের মাধ্যমে চেনা মানুষের অচেনা জগৎ গড়ে ওঠা নিয়ে কোনোরকম সংশয় নেই। বয়স্ক মানুষেরা খোঁজ নেন এবার কবে হচ্ছে তোমাদের বাউল গান? গেলবার তো---- সেই তিনদিন হলো, বড়ো আনন্দ পেয়েছি বাবা-বেঁচে থাকুক তোমাদের এই উৎসব। ফেলে আসা দিনের সঙ্গে বোধহয় বর্তমানের যোগসূত্র খুঁজে পান তাঁরা। গানের টানে ভীড় করে কমবয়সি অনেক ছেলে মেয়েরা, যাদের নিয়ে অবশ্য অনেকে আক্ষেপ করেন-এই প্রজন্মের সাথে তো কোনো আর শিকড়ের যোগ থাকল না তাকে ভুল প্রতিপন্ন করে। অর্থাৎ এই শহরের ভীড়ে একধরনের আবর্ত আছে যা কিনা এইরকম ফিকির খোঁজে মূর্ততার জন্য। সে গান ঘিরে নাকি বাউল-ফকিরদের ঘিরে রহস্য-রোমাঞ্চ বা তাদের দর্শন জানা নেই। বোঝা দুষ্কর ভবের হাটে আজ এ হয়তো দারুন পন্য। সে খোঁজ খবর যাঁরা করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো তাদের ভাব প্রকাশ করবেন।

তবে সংগঠনগত ভাবে এই উৎসবের আয়োজন করার কাজকে **মারফৎ** ক্রমশঃ কঠিন বলেই মনে করছে। কারণ প্রত্যাশা সব তরফ থেকে বেড়েই চলেছে– কি দর্শক–শ্রোতার কি বাউল–ফকিরদের। বাড়ছে খরচ আর দায়বদ্ধতা। অভাব শৃংঙ্খলাবদ্ধভাবে উৎসবের প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মানুষজনের।

নানা জনে নানারকম পরামর্শ দিচ্ছেন– কি ভাবে টাকা জোগাড় হতে পারে, বানিজ্যিক সংস্থার কাছ থেকে কি ভাবে পাওয়া যেতে পারে সহায়তা, সরকারি তরফের সাহায্য নাকি চেষ্টা করলে পাওয়া যায় –কিন্তু আমাদের আর ধন্দ্ব কাটে না। ঠিক কি করলে উৎসবের পরিবেশটি সকলের জন্যই অবারিত থাকে, সকলের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহন সম্ভব আমাদের জানা নেই। জানা নেই পৃষ্ঠপোষকতার ধরন আর উৎসবের বানিজ্যিকরনের সঠিক মিশেলের রসায়ন আর তার পদ্ধতি। তাই এর পরে উৎসব আয়োজনের ব্যাপারে আমাদের সংশয় থেকেই গেল। হয়তো বা বারে বারে তিনবারই।

কে কি দ্যাখে, কি খোঁজে – কিই বা পায় তা তারাই জানেন । এবারে আমরা চেষ্টা করেছি তিনটি লেখার মাধ্যমে সেরকম কিছু ইঙ্গিত দিতে।মৌসুমী তার গবেষনা আর ভালোলাগা ভালোবাসার জায়গা থেকে একটি লেখা দিয়েছে, সৌম্যদা অন্যের বয়ানে হাজির করেছেন নর্বনী ক্ষেপার কথা, আর সুরজিতের সহায়তায় পেয়েছি লিয়াকতের ফকির জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রকাশিত হচ্ছে গত বছরের উৎসব থেকে রেকর্ড করা কয়েকটি গানের একটি সি ডি। যা সুকান্ত না থাকলে কিছুতেই সম্ভব হত না।

এই পর্যন্তই। উৎসব প্রায় শুরু হয়ে গেছে। লেখা শেষ হয় নি। চূড়ান্ত গাফিলতি। আয়োজক হিসেবে ভুলত্রুটি মার্জনার অনুরোধ জানাই আর সব সফলতা আনন্দ আপনাদের জন্যই। এবারে শ্রী সুবল গোঁসাই কে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হচ্ছে, হাজির আছেন আগে আসা এবং নতুন অনেক মুখ। ভীড় বাড়ছে শ্রোতাদের– আর্শিনগরের পড়শীদের ও।

সম্পাদক

মারফৎ।

৫ই জানুয়ারি, ২০০৮

ক্ষেপা বাউল

ষাটের দশক, সত্তরের দশক, আশির দশক, নব্বইয়ের দশক — মোটামুটি চল্লিশ বছর ধ'রে কেন্দুলির জয়দেব মেলাতে কত শত বাউল ফকির সঙ্গ করলাম ভাই, কিন্তু একজনের কথা সব সময় মনে পড়ে।

বড়সড় চেহারা, বড় বড় চোখ, কমণ্ডলু নিয়ে ঘুরত। অনেক বাউল যে কড়োয়া ব্যবহার করে সে রকম নয়। লোকের ভিক্ষা ঐ কমণ্ডলুতে নিত। পরে সেই ভিক্ষা হাতে করে মানুষজনের মধ্যে ছিটাত। অকাতরে সমস্ত ভিক্ষা অন্যদের দান করে দিত। একেবারে ভোলাভালা ক্ষেপা বাউল। ঐ জন্যই লোকে ডাকত 'ক্ষেপা'। পিঠে কুলোর মতন চ্যাপ্টা এক জটা ছিল অনেক দিন। পরে একবার নবদ্বীপে গিয়ে ক্ষেপা ন্যাড়া হয়ে এল।

খুব গাঁজাপাগলা মানুষ ছিল ক্ষেপা। কিছুক্ষণ পর পর গাঁজায় দম দিত। গাঁজার আসরে ক্ষেপা থাকলে কেউ ছিলিম পেত না।

ক্ষেপাকে দেখেছি কেন্দুলিতে তমালতলার গায়ে বড় বটতলাতে। সঙ্গে ব্রজবালা। গানের আসরে ডুগি আর একতারা নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল, উপস্থিত শ্রোতাদের "এই - স'রে যা" বলতে বলতে। তারপর শুরু হ'ত নাচ তার সঙ্গে গান। আর সে কি গান! —

মানবদেহ-ঘরখানা হবে না
হবে না হবে না হবে না।।
ঘরের সম্মুখেতে বর্ষা ভারি
দিন থাকতে সেরে রাখলে না।।
দিব্য ঘরের পরিপাটি লাগাও হরিনামের খুঁটি
আড়ে রেখে জানলা দুটি ঘরামির কি মন্ত্রণা।।
আশুতোষ কয় কলির গোড়া
এই ঘরখানি চামড়ায় মোড়া
ঘরের পঞ্চম মাসে গঠন সারা
ভিত্‌রে আজব কারখানা।।

কাহারবায় গাইছে, গান কি দারুণ ঝোঁক, শরীর দুলছে, ডুগিতে তাল পড়ছে, একতারা সুর ধরে রেখেছে। ঘুরছে আর গাইছে। এদিকে ক্রমশঃ বাড়তে থাকা শ্রোতাদের ভীড়ে ক্ষেপার নাচের জায়গা সংকুচিত হয়ে এসেছে, অথচ ক্ষেপার অনেকটা জায়গা চাই। তখন হঠাৎ ক্ষেপা নাচতে নাচতেই চেঁচিয়ে বলত, "জায়গা ছেড়ে দে - বাউলের লাথি তো খাস নাই — পিছিয়ে যা — মাইর্‌ব লাথি।" অর্থাৎ গায়ে পা লেগে যাবে।

তারপর আবার নতুন গান শুরু —

গৌর কিছু দাও হে আমায়।।
আমি এ ভবে দোকান করি
অল্প পুঁজির ব্যবসা দিলে
লোকে বলবে ফেরারি।।
গৌর কিছু দিলে পরে কিনব মালা গোলকপুরে/ব্রজপুরে
বেচব মালা ঘুরে ঘুরে

যা করেন গৌরহরি।।
মালা নেব বসে ছাঁকা
রস্‌গোল্লা আর জিল্‌পি খাজা
খেতে লাগবে ভারি মজা
পায় না বিপিনবিহারী।।

একবার গান ধরলে শ্রোতৃমণ্ডলী সবাই চুপ।

ভাই, গান দুটো শুনে ক্ষেপার পরিচয় পেলে তো? ইনিই নবনীগোপাল দাস, নবনী ক্ষেপা! পরে জানতে পেরেছি ১২৯৯ সনে ৮ই আশ্বিন ক্ষেপার জন্ম, অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৯২ সালে। এঁরা সাত পুরুষের বাউল। নবনী ক্ষেপার ঠাকুরদাদা অনন্ত গোঁসাই, বাবা অক্রুর গোঁসাই এঁরা সবাই ছিলেন মাধুকরী বাউল। মাধুকরী শব্দের অর্থ বুঝলে তো? এঁদের কাজই ছিল মৌমাছির (মধুকরের) মতন বাড়ি বাড়ি গিয়ে অল্প অল্প ভিক্ষা সংগ্রহ করা। নবনী ক্ষেপা বালক বয়সে ছিলেন তাঁদের আশ্রম খড়গ্রাম থানার জয়পুর গ্রামে। কিন্তু এক জায়গায় বেশি দিন থিতু হ'ননি।

অন্ততঃ পঁচিশ জায়গায় আখড়া পেতেছিলেন — বসোয়া-বিষ্ণুপুর, গুলুরডুংরি, শ্রীরামপুর, বাঁধগোড়া, দাসপলসা, উব্রান্দি, লাভপুর, চারকলগ্রাম, দোলাইপুর, কুলেড়া - আরও কত সুন্দর সুন্দর নাম।

ব্রজবালার সঙ্গে তাঁর দুই মেয়ে তিন ছেলে হয়েছিল। প্রথমে অন্নপূর্ণা, সে অল্পবয়সে মারা যায়। তারপর মেয়ে রাধারাণী। তারপর তিন ছেলে - পূর্ণ, লক্ষ্মণ আর চন্দ্রধর।

নবনী দাস সাধক বাউল ছিলেন ভাই, সাধনা করেছেন দীর্ঘদিন। ছেলেমেয়ে সহ কারো সঙ্গে কথা বলতেন না সেই সময়। আবার নিজে গানও বাঁধতেন। কিন্তু ভণিতায় কখনও 'নবনী' নাম শুনিনি। 'আশুতোষ', 'বিপিনবিহারী' ইত্যাদি অন্য নাম বসিয়ে দিতেন। ওপরের গান দুটো ওঁরই বাঁধা।

পরবর্তীকালে রাধারাণীর কাছে অনেক অনেক গান শুনেছি। চক্রধরও গাইত। আর লক্ষ্মণ আর পূর্ণর কথা তো সবাই জানেন।

নবনী ক্ষেপার, বিখ্যাত পদ বেশ কয়েকটি —

''আমার যেমন বেণী তেমনি রবে'' তো আছেই, এছাড়া ''কে বানাইলে ঘর ধন্য কারিগর'', তারপর ''হরি কি দিয়ে, পূজিব রাঙা চরণ তোমার''।।

এই শেষোক্ত গানটাতে এক অদ্ভুত ভণিতা বসিয়েছিলেন — ''ঠাকুর রবি বলে পুরুষ নারী কে হে তুমি চিনতে নারি''। নিজের নাম দেবার কথা বোধহয় ওঁর মাথাতেই আসত না।

শেষ জীবনে নবনী ক্ষেপার পক্ষাঘাত হয়েছিল। ১৩৭১ সনের, ৭ই ভাদ্র ক্ষেপার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ ইংরিজি ১৯৬৪ সাল নাগাদ। সিউড়ির গায়ে কেঁদো (কেন্দুয়া)-তে নবনী ক্ষেপার সমাধি আছে। দেখে এসো না একবার।

শেষ জীবনে ওঁর সঙ্গিনী ব্রজবালা থাকতেন রায়পুরের কাছে গোপালনগরে। ঐ কেঁদোতেই তাঁরও মৃত্যু হয়।

এই হ'ল নবনী ক্ষেপার বৃত্তান্ত। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীতে বিবরণ জোগাড় করতে পার কি না দেখ। শম্ভু সাহার তোলা ফটোতেই নবনী ক্ষেপার 'ক্ষেপা' ভাব দেখতে পাবে।

প্রশান্তচন্দ্র রায় (লিখন : সৌম্য চক্রবর্তী)

আমার ফকির সঙ্গ

— লিয়াকত আলি

'এনাকে মসজিদে নিয়ে চলো।' লোকটি আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে বলায় আমি প্রথমে চমকে উঠি। পরে সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে যাই। মসজিদের খানকাতে হলেও কথা ছিল - কিন্তু একেবারে মসজিদে। কুলকিনারা পাই না আমি। লোকটি কি ফকির? চেহারা ও পোশাক-আশাকে ফকির বোঝা অনেক সময় খুবই দুরূহ। অনেকে কোনো কিছুই ধার ধারেন না। পরনে গোটানো লুঙ্গি। হাঁটু-অব্দি পা বেরিয়ে আছে। খালি গা। মাথায় লম্বা চুলও দেখছি না। তসবি নেই। যাকে বলা হলো সে বালকমাত্র। অপেক্ষা করছে আমার ওঠার। এখানে — এই শাসপুরে পৌঁছেছি আধ ঘন্টা আগে। জায়গাটা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। নামও শুনিনি। যে আমিন শা-র খোঁজে এসেছি - তাকেও চিনি না। শা ফকিরি পদবি। বংশানুক্রমিক ফকির বোঝায়। ঘুড়িষার গোলাম শা-র কাছে গিয়েছিলাম দুদিন আগে। বিখ্যাত ফকিরি গানের গায়ক। নাম গোটা মেলা জুড়ে। ঘুড়িষা ওর বাড়ি নয় - শ্বশুরবাড়ি। বাপুতি বাড়ি এই শাসপুর। কিন্তু বিয়ের পর তিনি শ্বশুড়বাড়িতেই থাকেন। আমিন শা গোলাম শার ভাই। তিনিও গায়ক। এছাড়া আরো বেশ কয়েক ঘর ফকির থাকেন এখানে। আমিনের ঠিকানা দিয়ে গোলাম বলেছিলেন, 'ওখানে যাবেন। বেলা দশটার আগে আমিও এদিক থেকে পৌঁছে যাবো।' বারোটা বাজছে। গোলাম আসেন নি। এদিকে আমিন শা-ও বাড়ি নেই। আমিনের ছেলেও নেই। সেই সকালে বেরিয়েছে মাধুকরীতে। ফিরতে বিকেল। সন্ধ্যাও হতে পারে। জানালেন আমিনের বউ। বউটি মাঝবয়সী, রঙ বেশ ফর্সা। তবে পরনের মোটা রঙিন ফুলছাপ সস্তা শাড়িটি খুবই ময়লা। উঠোনে, খোলা আকাশের নীচে, রোদ্দুরের মধ্যে, মাটির উনুনে কালো তোবড়ানো হাঁড়িতে ভাত রান্না হচ্ছে। পাতার জ্বালে আগুনের থেকে ধোঁয়াই বেশি। উঠোনের ওদিকে মাটির বাড়ি, অবশ্য ওটিকে যদি আদৌ বাড়ি বলা যায়। বাড়িটি জরাজীর্ণ ও বিধ্বস্ত — কোনোরকমে খাড়া হয়ে আছে। খড়ের চাল পচে ধ্বসে আছে। ঠাঁই ঠাঁই খড়ও নেই। উঠোনে ও বাড়ির দাওয়ায় ঘরোয়া জিনিস বিশৃঙ্খলভাবে পড়ে আছে। বাড়ির মধ্যে মুরগি চরছে, ন্যাংটো শিশু ঘুরছে। আধন্যাংটো একটি বালক, কোমরের পেছনে কাস্তে গোঁজা, মাথায় করে একবোঝা ঘাস নিয়ে এসে দাওয়ার ওপর ধপ্ করে ফেললো। উঠোনে একপাশে অন্য কারো বাড়ির পেছনদিক। তারই ছাচের নীচে খেজুরপাতার তালাই বিছিয়ে আমাকে বসতে দিয়েছেন বউটি। পরক্ষণেই এনে দিয়েছেন খাবার জল। তারপর দোকান থেকে চা-চিনি কিনে এনে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে করে দিয়েছেন চা। চার-চারখানি বিস্কুট দিয়েছেন সঙ্গে। বউটি সংকোচহীন খোলামেলা। নিজের ঘরের কথা যেমন বলছেন অনায়াসে, তেমনি আমার বাড়িঘরের খোঁজখবরও নিচ্ছেন।

সেই সকালে বেরিয়েছে সাতকেন্দুরী থেকে। সিউড়ি ঘুরে দূরবর্তী লাভপুর থানার এই শাসপুর। বাসে লেগেছে ঝাড়া তিনঘন্টা। সময় যাচ্ছে। গোলাম শা-ও আসছেন না। বউটি আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরে বারবার বলছেন, 'গোলামভাই না এলো তো কি হল? ও তো আছে। চিন্তা নেই। ভাত খান, আরাম করুন - আজ থাকুন। সে কাল যাবেন।'

বলতে হয় বলে এ কথা বলা নয়। ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে আপনজনের আন্তরিকতা আমাকে স্পর্শ করে। বাউলদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘোরাফেরা আমার। এটা অদ্ভুত, যে, ফকিরদের সঙ্গে আমার তেমন সঙ্গ করা হয় নি। ফকির গরিব জানতাম — কিন্তু তারা যে এতো গরিব জানতাম না। ইদানিং নানা জায়গায় ফকিরদের সঙ্গ করতে গিয়ে বুঝলাম। তবু এই সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যেও অতিথিসেবায় উজাড় এই অমলিন অন্তঃকরণ

কীভাবে টিকে আছে ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। শুনেছি ফকিরেরা নাকি আল্লার কাছে ধনদৌলত স্বেচ্ছায় নেয় নি। ধনদৌলত নিলে মানুষকে পাওয়া যায় না — তাই ধনদৌলত ছেড়ে তারা মানুষকে নিয়েছে। বউটির উস্কোখুস্কো চুল ঘিরে, নোংরা শাড়িতে, উনুনে ধোঁয়া ও পোড়া কালচে তোবড়ানো হাঁড়িতে, বাতা বেরোনো পচা খড়ের চালে, ন্যাংটো ও আধন্যাংটো শিশু ও বালকের চেহারায়, দাওয়াঠাসা তুচ্ছ জিনিসপত্রের আবর্জনায় যে বীভৎস দারিদ্র প্রকট — তাকে উপেক্ষা করে বউটি যতোই হাসতে পারুক, মানবিক ও আন্তরিক থাকতে পারুক, একে সহ্য করা খুব শক্ত। অভিজ্ঞতা থেকে এও দেখেছি এদের দারিদ্র নিয়ে আমার যতখানি উদ্বেগ, এরা কিন্তু নিজেদের ততো দরিদ্র বলে মনে করেন না — ততখানি উদ্বেগও তাদের নেই। তবু ছাচতলার ছায়ায় বউটির মুখোমুখি খেজুরপাতার তালাই-এ বসে এটাকে আমি কিছুতেই অতো সহজ বলে মেনে নিতে পারি না। কেমন কষ্ট পাই।

এইসব সাতপাঁচ চিন্তায় আচ্ছন্ন যখন, হঠাৎ এসে সামনে দাঁড়ান মানুষটি। আমার দিকে তাকান ককেয়বার। তারপর বউটির কাছে সব জেনে, হাতের কাছে একটা ছেলেকে পেয়ে নিদান হাকার মতো বলে ওঠেন, 'এনাকে মসজিদ নিয়ে চলো।'

সাময়িক বিমূঢ়ভাব কেটে যেতে আমি বলতে যাচ্ছিলাম — মসজিদে কেন, আমি তো ফকির ঘরে এসেছি। আমার বলার আগে বউটি বললেন, 'যান, ওখানেই যান। একা একা এখানে কতো বসে থাকবেন? যান, খাবার হলে পাঠিয়ে দেবো।'

কাকে বোঝাবো — মসজিদে মানে মিনার খিলান ও গম্বুজের আদিক অপরূপ সৌধ। যার ভিতরে থাকেন মৌলবি ও নামাজী মানুষজন। আমি নামাজী নই, আবার মৌলবিদের সঙ্গ ভালো লাগে না বলে দূরে থাকি। তারা যে সবাই বাজে লোক, তাদের কেউ জ্ঞানীগুণী নন — এমন কথা আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। তবু বলতেই হচ্ছে — আজ পর্যন্ত কোনো মৌলবি হাফিজ কারী আলেম অর্থাৎ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় মুখপাত্রের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় নি বা প্রগাঢ় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। বরং মৌলবি-না মানা বেনামাজী (বাহ্যিকভাবে) ফকিরদের সঙ্গেই আমার প্রাণের টান, নাড়ির নিবিড় একাত্মতা। এমনকি অনুগত্যও। আমি কোনো পীর মুরশিদের কাছে বায়েদ হইনি। অদীক্ষিত বলে ফকিরি সাধনার গুহ্যতত্ত্ব যেমন অজানা, তেমনি তাকে শরীরে কায়েম করার নিগূঢ় ক্রিয়াকরণের মধ্যেও আমি নেই। তবু তাদের গানে, আচার-আচরণে এবং অদীক্ষিত হলেও আমার কাছে রেখে-ঢেকে-বলা-আলাপ-আলোচনায় যে তত্ত্ব ও সাধনার হদিশ আমি আভাস-ইঙ্গিতে পেয়েছি, সেখানে প্রেমই শেষকথা। তাতেই বুঝেছি এরা আমার শুধু কাছের নয়, নিজের লোক। আমার কবিতাতেও সেটা চলে আসে — "মন্দির মসজিদের নামে ইঁটপাথরের খাঁচা নয়/সহজ বংশীধ্বনির মতো - নীড়ের থেকে নীড়/'আয়নামহল' যেখানে গড়ে উঠল, লালনের নৃত্যঅপরূপ একতারা উঁচানো হাত ধরে।" অদীক্ষিত হলেও আপন খেয়ালে কখনো গেয়ে উঠি "মুরশিদ যার সখা, তার কিসের ভাবনা/আমার হৃদয়মাঝে কাবা, নয়নে মদিনা।" আসলে ধর্মের (বাহ্য) আচরণবাদের আনুমানিক আল্লা ভজনায় আমার আস্থা নেই। উপলব্ধিময় মানুষ ভজনার সহজ পথেই আমার অস্তিত্বের উন্মোচন, স্বস্তি ও মুক্তি। তাই মৌলবির সঙ্গে স্বর মিলিয়ে যান্ত্রিকভাবে সুরা ও আয়াত পড়া হয়ে উঠল না। বরং সেই সুরা বা আয়াতের মগজমর্ম বা উপলব্ধি ফকিরের গানে আত্মিকভাবে বেজে উঠলে সেই গানের সঙ্গে আমার হৃদয় আপনা থেকেই মিলে যায় — "খুঁজলে পাবি না আল্লা সারাজীবন, বুঝে দেখ না মন/এই মানুষকে ভালবেসে সেই মানুষের (আল্লা) করে নাও সাধন।" কিংবা নিজেকে খুঁজে পেতে এই গান বারবার সূত্র হিসাবে আমার কাছে ধরা দেয় — "এভাবে জন্ম লয়ে মানুষ চিনলাম না/চিনলাম না মন ভজলাম না মন করলাম না উপাসনা/মানুষ চিনলাম না।" কাকে

বোঝাবো মিনার ও গম্বুজঅলা শরার ঐ মসজিদের চেয়ে এই ফকিরের পচা চালছাচ আরো তাৎপর্যময়, গভীর ও ব্যাপক মসজিদ। ফকির যার কাছে ইমাম, তাকে মৌলবির মসজিদে এই লোকটি পাঠাতে চায় কেন? বউটিও তার সাথে মেলাচ্ছে কেন গলা?

অগত্যা আমাকে উঠতেই হয়। ছেলেটির পিছু পিছু গ্রামের ভিতর দিকে এগিয়ে যাই। দরিদ্র অভাবী বাড়িগুলি চোখে পড়ে বেশি করে। মাঝে মাঝে একটা-দুটো দালানবাড়ি, মাটির উঁচু কোঠাবাড়িও। সম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের বাড়ি। গ্রামের যা-কিছু সম্পদ-জমি পুকুর বাগান এদের অধিকারে। এরা চাকরি করে, ব্যবসা করে, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠায়, আখের গোছাতে রাজনীতি করে, স্বার্থরক্ষায় দাঙ্গা বাধাতে কুণ্ঠিত হয় না। সর্বোপরি মন্দির-মসজিদ বানায়, পুরুত-মৌলবি পোষে। ধর্মীয় উৎসব এদের কাছে দৈনন্দিন সাংসারিক একঘেয়েমি থেকে মুক্তি এবং ভোগ ও স্ফূর্তির উদগ্র উপকরণ। শাস্ত্র হাদিশ কোরআনের স্বঘোষিত রক্ষাকর্তা হয়েও এরাই পদে পদে লঙ্ঘন করে নীতি ও সত্য। বিয়েতে পণ নেওয়া হারাম। অথচ পণ ছাড়া বিয়ে নেই। মৌলবিরা জেনেশুনেও এই বিয়ে পড়ায়। হারাম বিয়ে হালাল করে। হয় কি? তবু হয়। কেননা সমাজের মাথা তারাই। প্রশ্ন করার কেউ নেই। এরাই ফকিরদের বেশরা বেদ্বীন বেদাত বলে গালাগাল দেয়, নানাবিধ ফতোয়া জারি করে ও নানাভাবে হেনস্তা করে। মৌলবিরা তাদের মৌলবিত্ব ফলিয়ে সমাজে ইসলামের রক্ষাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে গণ্য হবার ও প্রতিষ্ঠিত হবার, এমনকি মাতব্বরী করার, হীন ধূর্ত কৌশল হিসাবে আরো অনেক জঘণ্য নাজায়েজী কাজের মতো ফকিরপীড়নও করে যায়। মারফতিরা বাড়লে তাদের বিপদ। মারফত যে মানসিক শক্তি ও প্রতিবাদ জন্ম দেয় তাতে মৌ-লোভী রিপুনেতৃত্বের সমাজবাগান ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। অগত্যা ফকিরপীড়ন ছাড়া উপায় কি? সাধারণ গরীব মুসলমান ধর্মের কিছু না বুঝলেও, কৃত্য পালনে তেমন নিষ্ঠ না থাকলেও, ধর্মভীরু ও রুজি-রোজগারের জন্য অবস্থাপন্নদের মুখাপেক্ষী হবার কারণে, মৌলবিদের চালিয়াতি অনেক সময় ধরতে পারে না বা পারলেও মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হয়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাজে তাই মৌলবিদের অধিপত্য। ফকিরেরা থাকে একপাশে পড়ে। জালাল শা ফকির কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন, 'মৌলবি আলেম হাফিজকারীদের সঙ্গে ফকিরদের কোনোদিন মিল হবে না। চিরদিন বিরোধ আছে এবং কিয়ামত (মহাপ্রলয়ের দিন) পর্যন্ত থাকবে।' এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'আসলে কি জানেন, ওরা কোরআনের হাড়মাংস দিয়ে টানাটানি করে, আর আমরা ফকিরেরা আছি মগজ নিয়ে। বলুন একসঙ্গে উঠাবসা সম্ভব? 'হাড়মাংস নিয়ে টানাটানির নজির ও পরিণাম চোখের সামনে দেখতে পাই। ঈদে ও বকরীদে প্রায় সব মুসলমান যায় ঈদ্গায়ে নামাজ পড়তে। তাদের সঙ্গে যায় অনেক ছোট ছেলেমেয়ে। নামাজের সময় তারা মাঠের বাইরে থাকে। নতুন রঙচঙে পোশাকে শিশু-বালকদের এই অনামাজী আনন্দউজ্জ্বল সমাবেশও উৎসবের উপরি পাওনা। এটা হলে ভাল ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। এই শিশু-বালকদের অনেককে বড়োদের খুলে রাখা জুতো-চপ্পল আগলানোর ভার দেওয়া হয়, যাতে চুরি না হয়ে যায়। পয়সার বিনিময়ে তারা অচেনা লোকেরও চটি-জুতো আগলায়। এমনি পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ুক না পড়ুক, ঐ পবিত্র দিনটিতে ঈদ্গায়ে উপস্থিত সকল নামাজী। এই নামাজীরাও তাদরে মধ্যে ঢুকে থাকা চোর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ঐ পবিত্র দিন, ঐ পবিত্র নামাজ পাঠ, অন্তত সাময়িক হলেও মানুষের ভিতেরর আবর্জনাকে পরিষ্কার করা দূরে থাক ধামাচাপাও দিতে পারেনি। শরিয়তের বাহ্য আচরণ পালনে যে মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিগুলি দূর হয়ে যায় না এর থেকে তার বড়ো প্রমাণ আর কি হতে পারে? ফকিরেরা তাই বলে — যতই পড়ো লোকদেখানো শরার নামাজ, মারফতি চেতনা ছাড়া না হবে তোমাদের নামাজ, না হবে তোমরা মানুষ। মারফত-ই আত্মপরিচয়, যা না পেলে যতই পড়ো কোরআন, সে শুধু কাগজ আর কালি — জীবন সম্পর্কে

যথার্থ জ্ঞান হবে না। এসব কথা বলতে গেলেই, এবং ফকিরেরা বলবেই, মৌলবি ও গোঁড়া শরিয়তি মুসলমানদের যত ক্রোধ। পরিণামে ফকিরদের একতারা ভাঙা, চুলদাড়ি কাটা, মারধর, আবাসত্যাগে বাধ্য করা, আরো কত কি?

এছাড়াও মুসলমানত্বের নামে উর্দু — আংশিক হিন্দিরও — ভাষা-সংস্কৃতির ছাপ মৌলবির কথাবার্তা, পোশাক ও আচরণের যতখানি সুস্পষ্ট, তার কণামাত্রও বাংলা বা বাঙালির নয়। এখানেও ফকিরের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত। উর্দু-হিন্দু পরিত্যাগ করে এরা বাংলা ভাষাতেই রচনা করেছে গান, গাইছেও বাংলাতে। সাধনতত্ত্বের ভাবকে প্রকাশ করতে এরা আরবি ফারসি কখনো বা উর্দু শব্দ ও ভাবধারাকে আত্মীকরণ করে বাংলার ভাবধারা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বাঙালির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরো ব্যাপক, প্রসারিত ও প্রকাশোক্ষম করে তুলেছে। মৌলবিদের মতো বাঙালি জাতিসত্তাকে উপেক্ষা করেনি, বরং সুহৃদ ও বন্ধু হয়ে উঠেছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে ফকিরের উদার, মানবিক ও সমন্বয়বাদী ভূমিকাকে যে গোঁড়া ও পরগাছা মৌলবিরা হিন্দুয়ানির ছাপ বলে অপব্যাখ্যা করবে এবং শুদ্ধিকরণের নামে খড়্গহস্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানদের লেলিয়ে দেবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

ছেলেটি ছোট্ট একটি মাটির ঘরের সামনে দাঁড়াল। আমাকে বললো, দাঁড়ান, খাদিম আছে কি না দেখি।'

যাচ্ছি তো মসজিদে। খাদিমের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। মসজিদে খাদিম থাকেন না। খাদিম পীরের মাজারের সেবাইত। খাদিম কারো নাম নয় তো? বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

চাবি হাতে ছেলেটি ফিরে এসে বললো, 'চলুন।'

'খাদিম না কি বলেছিলে, সে কই?' জিজ্ঞাসা করি।

যেতে যেতেই ছেলেটি বলে, 'আসছে।'

'কিন্তু মসজিদে তো খাদিম হয় না।'

ছেলেটি এবার দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকায়, 'খাদিমই বলে লোকে।' তারপর আবার চলতে থাকে।

গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা মাটির ঘর। টিনের ছাউনি। টিনগুলো নতুন, ঝকঝকে। হালে লাগানো। দাওয়াটা বেশ উঁচু, দাওয়ার চালটা খড়ের। ঘরটার পাশে দাওয়ার সমউচ্চতায় ইঁট-সিমেন্ট দিয়ে বাঁধা কিছুটা জায়গা। ছাত নেই, ওপরটা ফাঁকা। সেখানে একটা কবর। কবরটাও ইঁট-সিমেন্টের বাঁধা — মাছের পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে। তালা খুলে ছেলেটি ঘরের ভিতর ঢুকল। ওর পিছু পিছু আমি। ভিতরটা নিকানো, পরিচ্ছন্ন। এক কোণে জলের কলসি, পাশে গ্লাস। অন্য কোণে খেজুরপাতার দু-তিনটে তালাই। দেওয়ালে ঝোলানো একটা লণ্ঠন। তাকে কয়েকটি বই ও খাতা। পাশে একটি বোতল, তাতে বোধহয় কেরাসিন তেলই থাকবে। মেঝের উপর একটা তালাই বিছিয়ে ছেলেটি বসতে বলল। একটা ধাঁধার মধ্যে আমি কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে তালাই-এ বসে ভাবছি - মসজিদে বলে এ আমি কোথায় এলাম? ছেলেটি ভুল করে নি তো? আর যদি ভুল করেও থাকে — সেটা আমার পক্ষে স্বস্তিদায়ক হয়েছে। আমি অন্তত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। ছেলেটি এক গ্লাস জল বাড়িয়ে দিল। ঢক ঢক করে সেই জল গলায় ঢাললাম। এমন সময় একজন লোক ঘরে ঢুকলেন। ছোটখাটো সাধারণ চেহারা, লুঙ্গির মতো করে পরা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। ঢুকে আমাকে দেখে বললেন, 'আমি খাদিম।' তারপর আমি পরিচয় দিতে বললেন, 'গোলাম ভাই-এর আসার সময় এখনো আছে, এসে যাবে। আর না এলেও চিন্তা নেই। আমরা আছি। তবে এখন কাউকে পাবেন না। নিজের নিজের কাজের ধান্দায় গেছে। সন্ধ্যার পর সকলকে এখানেই পাবেন। থেকে যান আজ।'

দরজার বাইরে রাস্তায় দেখা গেল এক ফেরিওলাকে। মাথার ডালিতে ভাঙা পরিত্যক্ত জিনিস ডাঁই হয়ে

আছে। খাদিম তাকে ডাকতে ওখান থেকে সে বলল, 'আসি এগুলো রেখে।'

'আমাকে মসজিদে নিয়ে যেতে বলল একটা লোক। আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।' খাদিম আমার দিকে চোখ ফেরাতে বললাম, 'যাক ছেলেটি সে কথা না শুনে এখানে এনে ভালোই করেছে।'

'ছেলেটি আপনাকে মসজিদেই এনেছে' বললেন খাদিম। 'মসজিদে?'

'হ্যাঁ, এটাই তো মসজিদ।'

'মসজিদ!'

এবার হেসে উঠলেন খাদিম, 'আপনি মিনার গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন না তো?'

'তাছাড়া আবার মসজিদ হয় নাকি?'

হাসতে হাসতে বললেন খাদিম, 'এটা সে মসজিদ নয়। এটা ফকিরের মসজিদ। আমরা ও মসজিদে যাই না।'

ফকিরের মসজিদ বলে কখনো কিছু শুনি নি। ফলে ঘরটাকে নতুন করে দেখতে লাগলাম। আর যিনি দেখালেন সেই খাদিমকে দেখছিলাম আরো বেশি করে।

সেটা লক্ষ্য করে খাদিম ব্যাখ্যা করলেন, 'মসজিদ কি? এবাদতখানা তো? আকার-প্রকার তো গৌণ। এটাই আমাদের এবাদতখানা।'

'নামাজ-টমাজ এখানে —'

'পড়ি বৈকি। তবে আমাদের নামাজ তো গুরু নির্দেশিত বাতুনী নামাজ। ওসব টাইম-বাঁধা শরার নামাজ নয়। এছাড়া গানবাজনা করি, গুহ্য সাধনাও কিছু আছে — এসবও এবাদত।'

'আচ্ছা, আপনারা যে বিকল্প মসজিদ বানিয়েছেন, ও মসজিদে যান না — তা কি অন্যেরা ভাল চোখে দেখে?

'ও মসজিদের যারা ভক্ত' — একটু থামেন খাদিম, 'আমাদের কোন জিনিসটাকে ভালো চোখে দেখে?'

'না — মানে বলতে চাইছি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের সঙ্গে চলতে না চাইলে অশান্তির সম্ভাবনা তো থাকেই।'

'অশান্তি সেরকম নেই। আসলে আমরা নিজেদের মতো শুধু নেই, নিজেদের মধ্যেই আছি। এই যে এটা দেখছেন —'

'মানে, মসজিদটা?'

হ্যাঁ, মসজিদটাই। আমরা নিজেরা, মানে গুরু-ধরা আমরা যতজন আছি, খুব গরিব আমরা - রিক্সাওলা, ফেরিওলা, জনমজুর, ভিক্ষাজীবী, গায়ক — জমি কারোর নেই, থাকার বলতে খড়মাটির সামান্য ভিটেটুকু - তা আমরা বহুদিন ধরে ঘরে ঘরে মুঠি মুঠি চাল পয়সা জমিয়ে এটা করেছি। বাইরের কারো সাহায্য নিই নি। নাক গলানোর সুযোগ রাখিনি।' 'তাতেও কি ঝগড়া আটকায়? শুধু মত-পার্থক্যের কারণে ফকিরদের উপর নদিয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে অকথ্য অত্যাচার তো কম হয় নি?'

'হ্যাঁ হয়েছে — হচ্ছেও। কিন্তু এখানে তেমন হয়নি।' একটু থেমে খাদিম বলেন, 'হবে না বলতে পারছি না, তবে আমাদের বীরভূমে এমন ঘটনা খুব কম।'

মৌলবি ও গোঁড়া মুসলমানদের সঙ্গে ফকিরদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নানা কারণে অসম্ভব। বীরভূমের নানা জায়গা ঘুরে এই বিরোধ বেশ ভালমাত্রায় দেখছি — যদিও নদীয়া, মুর্শিদাবাদের মতো ততোটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায় না। কিছুদিন আগে জালাল শা ফকির ও তালেব শা ফকিরের সঙ্গে দুবরাজপুরের কাছে এক মুসলিম বাড়িতে যাই। গৃহকর্তার ছেলের মুসলমানি। সন্ধ্যায় মিলাদে শেষ হতে বড় জোর আটটা। কথা সেরকমই। তারপর ফকিরি গান। একটু দেরি করে পৌঁছলেন ফকিরেরা। আটটা তিরিশ-এ। তখনো জানি না

মৌলবি প্রধান ঐ অনুষ্ঠানটিকে এড়ানোর জন্য ইচ্ছাকৃত এই দেরি। বিলি করা সরকারি খাস ডাঙ্গা জমির উপর হালে গড়ে উঠেছে খেটে-খাওয়া মানুষদের গ্রাম। এড়াছেড়া ঘর। রাস্তার একদিকে মুসলমান, অন্যপাশে নিম্নবর্ণের হিন্দু। কাছাকাছি গিয়ে দেখি তখনো চলছে মৌলবির বক্তৃতা। ফলত রাস্তার এপাশে একটা চা-দোকানের সামনে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসল দুই ফকির। চালার মধ্যে লণ্ঠন কমিয়ে শুয়েছিল দোকানি। জালাল শা ফকিরের গলা পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বলল, 'বাবা আপনি।'

জালাল শা উত্তর দেন, 'হাঁ বাবা, গান-বাজনার জন্য বলেছে। তা এখনো ওই তো চলছে, একটু অপেক্ষা করি।'

দোকানি একটা তালাই এনে পেতে দেয়। বলে, 'ভালো করে বসুন বাবা। আঁচ তো নেই। একটু চা — বলেন তো —'

'না না, অত ঝামেলার দরকার নেই।'

'চা টা এখন থাক বাবা', তালেব ফকির বলেন, 'এই নিন, আপনি বরং একটা বিড়ি খান।'

এখান থেকেই দেখা যায় রাস্তার উপর ঘর। বাঁশের খুঁটির উপর তালপাতা ছাওয়ানো। খোলা উঠানে। খুঁটিতে ঝুলছে হ্যাজাক লাইট। উঠোনে একটা কাঠের তক্তায় বসে মৌলবি উথালপাতাল হাত নেড়ে আওড়াচ্ছে শাস্ত্রবাক্য। কণ্ঠস্বরের ওঠা-পড়ায় এমন অন্ধ উন্মাদনা - তাকে থামায় কার সাধ্য। মাথায় টুপি গামছা রুমাল নিয়ে সামনে বসে আছে কিছু লোক।

'হাঁ তালেব, কি করা যায়?' জালাল শা বলেন।

তালেব বলেন, 'ফের-ই বটে।'

দোকানি বিড়ি ধরায়। জালাল শা-কে বলে, 'ঐ আল্লা আল্লাবালাকে সেদিন যা দিলেন বাবা, খুব ফটফটানি ওর, তবে সেদিন ব্যাটা বুঝেছে কার পাল্লায় পড়েছে।'

'কার সঙ্গে আবার কী হল,' আমি শুধাই।

'আর বলেন না — এখানেই একজন থাকে, দাড়ি আর টুপির কারদানী। যাকে তাকে কথায় কথায় অকারণে শাস্ত্র ঝাড়ছে। আর মুখে আল্লা আল্লা। এই দোকানে বসে আছি, কথা নেই বার্তা নেই খামোকা একজনকে বলছে — গাঁজা মকরু, সিদ্ধি তাড়া মকরু, মদ হারাম। এসব একেবারে দোজখের পথ। আমরা ফকিরের গাঁজা খাই তো — লোকটাকে উপলক্ষ্য করে ও বলছে আমাকেই। শুনেও শুনছিলাম না, তাতে ও অনেক ফালতু কথা বলতে লাগল। আর থাকতে পারলাম না। বললাম, "এই, ফটফটর তো করছ খুব, বলো কুকুর হারাম না হালাল?' ও বললো, "হারাম, নির্ঘাত হারাম।" তখন আমি ওকে চেপে ধরি, "শাস্ত্র নিয়ে বুড়বকের মতো লাফাচ্ছ, সেই শাস্ত্র কি বলছে বল — কুকুর সবার আগে বেহেস্তে যাবে কি না?" লোকটা একেবারে চুপ। তো তো করে বলে, "হাঁ, এও একটা মশলা বটে।" ব্যাটাকে ছড়ি না আমি, "এবার বল শুধু গাঁজা মদ তাড়ি হারাম, আর কিছু হারাম নয়।? আগে বল তোমার মুখটা হারাম না হালাল? মদ তাড়ি না হয় খাও না তুমি, বল মিছে কথা বল কিনা? হারাম রুজি খাও কিনা? তোমার বহু ব্যাপার জানি, ভিতরের জন্তুটা সব গিলছে — মিছে বলবে না।" লোকটা তো তো করতে আল্লা আল্লা করে ওঠে। অনেক লোক ছিলো বসে, সবাই হেসে ওঠে। বলে, "ছেড়ে দিন বাবা, ছেড়ে দিন।" ছাড়ি না ওকে, বলি, "নিজের মুখই তোমার হালাল নয়, হারাম হালালের বিচার করতে আসছো? কোন ভেদে শাস্ত্র কী বলছে সে রহস্য তুমি বোঝো? মৌলবির কাছে শুনে ফটফটাচ্ছ। তোমার ঐ মৌলবিগুলোই দাড়ি-টুপি নিয়ে, আল্লা আল্লা বুলি নিয়ে যে বেশির ভাগ দোজখে যাবে, এটাও তো শাস্ত্রের কথা।" "আর নয় বাবা, আর নয় বাবা," বসে থাকা লোকগুলো সমস্বরে বলে ওঠে। ওদেরকে বলি, "না বাবা, এদের দিতেও হবে, না হলে হুঁশ হবে না।" লোকটা পথটা পায় না

পালাবার। সেই থেকে আমাকে দেখলেই আর সেখানেই থাকবে না।'

'ঐরকম এরও একবার পাওয়া দরকার।' তালেব বলে উঠলেন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটানো ভাষণরত মৌলবিকে লক্ষ্য করে।

তালেবের কথায় আমি হেসে ফেললাম। আমাকে হাসতে দেখে তালেবও হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'সিনেমার নায়ক দেখেছেন, পার্টির নেতা, কেমন ডায়লগ দেয়, এও একই, হুবহু এক। তাক লাগানো গলায় এমন হাত নেড়ে হদিশ কোরআনের বড় বড় কথা বলবে যে মনে হবে এই পাপী মানুষদের হেদায়েত দিয়ে সৎপথে ফেরানোর জন্য ওদের ঘুম নেই। আসলে সব অভিনয়, সব ভাষণ, সব ডায়লগ। যে-সব বড় বড় কথা বলছে তা মুখস্থ করা, মুখের কথা — ভিতরের যোগ নেই, তাৎপর্য বোঝে না, মানেও না। সব লোকদেখানো, সেজে থাকা। মাতব্বরীর ব্যাপার, রোজগারের ব্যাপার। সবই সিনেমা।'

জালাল শা ফকির কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'ঐ দেখছেন এখন মহাপুরুষের মতো দিব্যভাব, পরে খাওয়াটা যদি জুতসই না হয়, প্রাপ্য টাকাটা কম হয় — দেখবেন সিনেমা নেই, আসল বাস্তব, হিরো তখন ভিলেন হয়ে গেছে।'

জালাল শা ফকির ও আল্লা-আল্লা বুলি লোকটার গোটা ঘটনাটা কথা প্রসঙ্গে এসে যায়, খাদিম শোনে। ভাঙাচোরা জিনিসের বোঝা ঘরে রেখে ফেরিওলা লোকটিও তখন মসজিদে এসে বসেছে। সেও শোনে।

খাদিম মন্তব্য করেন, 'বুঝি, এটা মাঝে মাঝে খুব দরকার, তবু অত সরাসরি আক্রমণ করে কিছু বলি না আমরা। এড়িয়ে যাই, সহ্য করে নিই। বললেও নরম গলায় বলি। জালাল শা বিখ্যাত সুফি সাধক আলম শা বাবার মাজারের প্রধান খাদিম। বাবাকে এলাকার লোক দারুণ মানে। খাদিম হওয়ায় জালাল শা-রও মর্যাদা অনেক। ওভাবে বললেও ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে চায় না।'

'তাহলে মসজিদের খাদিমের চেয়ে মাজারের খাদিমের দাপট বেশি বলে মেনে নিচ্ছেন আপনি?'

আমার কথার পরিহাস বুঝতে পেরে খাদিম হাসলেন। বলেন, 'হুঁ, তা তো বটেই।'

'কিন্তু মৌলবিদের মতো অভিনয়ে বহু ফকিরও তো ওস্তাদ, বহু দুনম্বরি ফকিরও তো দেখা যায়। আপনি কি বলেন?'

'হাঁ, তা যায়। তবে কথাটা তা নয়। দু নম্বরীদের কথা ছাড়ুন — আসলে মৌলবি ও আসল ফকিরেও বহু তফাৎ, কথা এটাই। বুঝে দেখুন আপনি।'

ঠিকই বলেছেন খাদিম। তফাৎ-টা দুটো লাইনের। আমি যতোটুকু বুঝি — একটা হল আত্মসংযোগহীন যান্ত্রিকতার, বাহ্য আচার পালনের, অনুকরণের, চিন্তাহীন অন্ধত্বের, সবজান্তা মুখস্তের লাইন। অন্যটা উপলব্ধির, আত্মপরিচয়ের ও সৃষ্টির লাইন। আত্মঅনুশীলনজড়িত রহস্যের পথ। মৌলবির ভাষণ ও ফকিরের গান — দুই-ই শুনেছি। একটা হল কাঠখোট্টা বিবৃতি। আর ফকিরের গানে থাকে উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব ও সাধনার কথা, পাশাপাশি সেখানে পৌঁছতে না পারার বেদনা, ব্যর্থতা, হতাশা, আত্মধিক্কার ও ক্রন্দন। এসবের মধ্যে আবার আছে আনন্দ। এ তফাৎ, এ পার্থক্য বুঝতে খুব একটা জ্ঞানবুদ্ধি লাগে না।

খাদিমের কথায় আমি মুগ্ধ। তারিফ করার মতো উত্তর। হঠাৎ চোখে পড়ে ফেরিওলা লোকটি গাঁজা বের করে হাতে দলছে। দেখে বিস্মিত হলাম। মসজিদও বলছে — আবার গাঁজা! ছিলিম ভরতে ভরতে লোকটি আমাকে শুধায়, 'চলবে তো?'

'হাঁ, মানে মসজিদে —'

লোকটি রহস্য করে হাসে। বলে, 'গাঁজা খাই আমরা, হারাম মকরু মনে করি না। যা খাওয়া ঠিক মনে করি

না, কোথাও খাই না। যা খাই তা সবখানেই খাই। তাই গাঁজাটা এই মসজিদে খেতে দোষ কি?'

খাদিম ছিলিমে টানা দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আমাকে বাড়িয়ে দেন। বলেন, 'ফকিরের মসজিদ তো — নিয়মকানুন কিছুটা আলাদা। তবে নিয়ম আছে, আমরা তা মেনেও চলি। গাঁজা খাই ঠিকই, তবে খারাপ কথা পরচর্চা পরনিন্দা এখানে পাবেন না। গানবাজনা কৃত্যকর্ম এবাদত এসব নিয়েই পড়ে থাকি।'

যতোবার ছিলিম ঘুরে আসে, দারুণ সুখ-টান মারে লোকটি। ধোঁয়া ধরে রেখে মস্তি করে নাকমুখ দিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়ে। ছিলিম শেষ হলে খাদিম লোকটিকে তার ঘরে পাঠান। আমাকে বলেন, 'বেলা হল অনেক, এবার সেবা করুন, বিশ্রাম নিন। রাতে তো আছেন — অনেক সময়, কথা হবে।'

কলা, রুটি, মিষ্টি ব্যাগে আছে আমার। দুপুর ও রাতে ওর থেকে হয়ে যাবে। খেতে তো হয়ই। খাওয়া জিনিসটা বুঝি। খাওয়ানোটাও বুঝি কমবেশি। কিন্তু সেবা — ততোটা বুঝি কি? খাওয়া ও সেবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বহুবার টের পেয়েছি আমি এই সেবা নিতে নিতে। অবশ্যই পেয়েছি এই দীনতিদীন বাউলফকিরদের মধ্যে। তুচ্ছ ডাল ভাত আলুসেদ্ধও যে সেবাদাত্রীর প্রেমভাব ভক্তি আত্মনিবেদনের ছোঁয়ায় এমন ঐশীস্বাদময় হয়ে ওঠে — সেরা খাদ্যের এলাহি আভিজাত্যকেও টেক্কা দেয়। আজ সেবা নিতে নিতে পাচ্ছি তৃপ্তির আরেক মাত্রা। আয়োজন বেশ ভালো। ভাত ডাল তিন-চার রকমের তরকারি-মাছও আছে। কিন্তু এই ভাত বহু বাড়ির মুষ্ঠিতোলা ক্ষুধার্তের আন্তরিক দানে স্বর্গীয়। তরকারি খেতে গিয়েও টের পাই নানা পরিবারের ত্যাগ ও মহিমা। প্রতিটি গ্রাসে অনুভব করি মানুষের প্রতি উৎসর্গীকৃত মানুষেরই ভালবাসার গভীরতম তৃপ্তি। এ তো তুচ্ছ খাদ্য নয় — এ মহাপ্রসাদ, শিন্নি। এ সেবার সৌভাগ্যঋণে হৃদয় ভরে ওঠে আমার। বাউলদের সঙ্গে মিশছি বহুদিন — বছর পনেরো তো হবেই। সকলেই প্রায় চেনা। অনেকের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। কিন্তু ফকিরদের সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। হয়েছে হালে। বছর পাঁচের বেশি নয়। ফকিরদের প্রতি অনাগ্রহের কারণ — একদিকে যেমন মোল্লা ও মৌলবি শাসিত আমার বাড়ি ও গ্রামের পরিবেশের প্রভাব, অন্যদিকে সে-এলাকায় যথার্থ ফকির ছিলো না। ছ সাত মাইল দূরে একমাত্র একটি গ্রামে কয়েক ঘর যারা ছিলো — তারা গানবাজনা করে না, শুধুই ভিখিরি। গ্রামের ধর্মভীরু লোকেদের, বিশেষ করে পুরুষদের অনুপস্থিতিতে মহিলাদের, যাকে-যেভাবে-হোক ভয় ধরিয়ে অসহায় করে এবং পরিত্রাণের উপায় বাতলাবার টোপ ঝুলিয়ে, শুধু ঝাড়ি মেরে, চাল টাকাপয়সা মোরগ-মুরগী যা পেতো হাতিয়ে নিতো। সাধারণ লোককে শুনতাম ওদের সম্বন্ধে বাজে মন্তব্য করতে, এমনকি ঘৃণা করতে দেখেছি। ছেলেবেলায় আমার দেখা ফকির এরাই। ফকির নামে হতচ্ছাড়া এরাই। ফলে ফকিরদের সম্পর্কে অনাগ্রহ ও উপেক্ষার মনোভাব থেকে গেছিল। ধারণাটা বদলে গেলো বহু বছর পরে, বছর ত্রিশ বয়স যখন আমার। ভারতের নানা ধর্মীয় স্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঅঞ্চল ঘুরে পৌঁচেছি আজমীঢ়ে। সঙ্গে সিরিয়া কায়ারমা। এক সুইডিশ তরুণী। সে কবি, আমার সুফি চেতনার অনুরাগীও। আজমীঢ়ে যাওয়ার মুলে সে-ই। অসামান্য এই আজমীঢ়। পাহাড়ময় এক প্রাকৃতিক ঢেউ — এ সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। আর অভূতপূর্ব সেই দিনটা — যা জীবনে হয়তো একবারই আসে। সকাল সকাল খাজা বাবার মাজার ঘুরে চলেছি তারাগড় পাহাড়ের দিকে। কিছুটা ফাঁকায় গিয়ে রাস্তার ধারে একটু উঁচু জায়গায় গাছের নীচে এক হতদরিদ্র ফকিরের চালঘর। দেখতে তাঁবুর মতো। ছেঁড়া পলিথিনে ছাওয়ানো। সামনে একটা বড় জলের জালা। রাস্তার পিপাসার্ত লোকেদের জলসেবার জন্য ফকির আর ফকিরণী — উভয়ের পোশাক অত্যন্ত সাধারণ ও মলিন। এমনকি ছেঁড়াও। শরীরও সুবিধার নয়। বোঝা যায় শরীর বা পোশাক কোনোদিকেই তাদের লক্ষ্য নেই। সিরিয়া কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ফকির জলের জগ এড়িয়ে দেন। সিরিয়া আমাকে বলে, ফকিরি গান হবে না লিয়াকত? ওকে বল না।'

জলের মগটা আমি নিই, একটু জলপান করি, তারপর বলি, 'বাবা, একটু ফকিরি গান শুনতে চাই, দয়া করে যদি শোনান।'

'গান?' ফকির কিছুক্ষণ চুপ করে আমাদের দেখে তারপর বলেন, 'আপনারা তো তারাগড়ে যাচ্ছেন, ঘুরে আসুন — তখন।'

ঘুরে যখন এলাম তখন প্রায় এগারোটা। এসে দেখি ফকির নেই। ফকিরণী বসতে আসন পেতে দিলেন গাছের নীচে ছায়ায়। বসে আছি তো আছিই। ফকিরের দেখা নেই। ফকিরণীকে শুধালে বলেন — আসছে, আসছে। ফকির এলেন সাড়ে বারোটায়। সঙ্গে আরো তিনজন। কাপড়-বাধা ডেকচি ও পাত্রগুলো তারা ফকিরণীকে দিয়ে আমদের কাছে বসলো। কথাবার্তা তেমন কিছু হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল খাদ্যপর্ব। থালাভর্তি পোলাও ও বাটিভর্তি মাংস। আমরা শুনতে চাই গান। কিন্তু, এ কি কাণ্ড। বেশ হতাশ হয়ে পড়েছি। লোকগুলোকে তো ফকির বলে মনে হচ্ছে না। স্বাভাবিক লুঙ্গি ও জামা। একজনের মাথায় অবশ্য জড়িপাড় সবুজ চাদরের ফেট্টি বাঁধা। মুখে অপূর্ব দিব্য হাসি। কিন্তু বাদ্যযন্ত্র কই? গায়ক নিশ্চয়ই নয়। খাবারের এরকম এলাহি ব্যবস্থা এই দুঃস্থ ফকির করলো কিভাবে।? নাকি খাজাবাবার লঙ্গর থেকে এনেছে? আনলেও তা তো ওদের নিজেদের জন্য। চেনা নেই জানা নেই, উটকো লোক আমরা, আমাদের এভাবে খাওয়ানো কেন? এমনও হয়। এতখানি হয়। খাওয়াপর্ব চুকলো বেশ ধীরেসুস্থে। এঁটো থালাও ধুতে দেওয়া হলো না। ফকিরণীই ধুলেন। এরপর ফকির সবার হাতে তুলে দিলেন কাটা সুপারী। 'মাথার-ফেট্টি' দিল লবঙ্গ। খানিকক্ষণ ওসব চিবিয়ে শুরু হল ধূমপান ও আলাপচারিতা। 'মাথায়-ফেট্টি-দিব্যহাসি' জানালো তার নাম সুলতান আমেদ। বাকীদের নাম এখন মনে নেই।

উদ্বেগ চেপে না রাখতে পেরে বলি, 'আমার এই বন্ধুটি ফকিরি গানের খুব ভক্ত। গানের জন্য ফকিরবাবাকে —

'হবে হবে', সুলতান বলে।

'কিন্তু কিভাবে আপনারা গাইবেন? বাদ্যযন্ত্র কিছু তো দেখছি না।'

'হাঁ গো হাঁ —' বলে সুলতান আবার দিব্যহাসি হাসে।

প্রসঙ্গ আবার নানা কথাবার্তায় চাপা পড়ে যায়। এদিকে একজন বেশ তরিবত করে গাঁজা দলতে থাকে। ছিলিমে ভরার আগেই ফকির নিয়ে আসেন থালির উপর রাখা চায়ের কাপ। জলভর্তি মগটা ছিলো পাশেই। চা খেয়ে সকলে হাতে জল নেয়। এরপর চলে ছিলিমে দম। সিরিয়া খুব একটা খায় না। কিন্তু এখন তার লম্বা টান দেখে বুঝতে পারি বেশ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। আমিও কি করবো খুঁজে না পেয়ে গাঁজায় টান দিতে থাকি ভালোরকম।

গাঁজা শেষ হতেই ওদের নিজেদের মধ্যে ঘটে গেলো ইসারাবিনিময়। জল ফেলে নিয়ে একজন হাতে তুলে নিল মগ। সুলতান নিল থালি। অন্য একজন পকেট থেকে চিরুণি বের করে কাগজ সেঁটে নিয়ে ধরলো মুখে। ফকিরের হাতে উঠে এলো চিমটে। অতকির্তে বেজে উঠলো থালা মগ চিরুণিবাঁশি ও চিমটে। এবং সেই সাথে সুলতানের গলা — 'কেউ ফিরবে না খালি হাতে খাজা বাবার দরবারে।'

চলতে লাগলো গানের পর গান। আর গানের মধ্যে অব্যর্থ মোক্ষম সেই আচমকা ফকিরি আওয়াজ যা সংগতকারীরা করছে, যা নাভি থেকে নৈঃশব্দ চিরে তাবৎ হৃদয়বত্তাকে নাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসচে। সেই মুহূর্তগুলোতে গান যেখানে চলে যাচ্ছে — সেখানে অনুভূতির বিস্ফোরণে তত্ত্ব ও বাস্তবের মুছে যাওয়া বিভেদরেখায় একাকার জীবন ও জগৎ, চেতনা ও জড়। আর কিছুই নেই, শুধু উপলব্ধির জগৎ। ঐহিকের

গভীরে গভীরে আত্ম-আস্বাদনের গভীরতম ঐশী ব্যঞ্জনা। যাকে বলে আত্মহারা হয়ে গেছি আমি। এ এমন এক আমি, যাকে আমি কোনোদিনই চিনতাম না।

আমি বুঝতে পারি — ভালো গলা, ভালো যন্ত্র, দারুণ নাচ — সব মিলিয়ে জমে ওঠা গান এক জিনিস; আবার বাদ্যযন্ত্র ও নাচের অপরিহার্যতা ছাড়াই যে-গান হয়ে উঠতে পারে গান — সে আরেক জিনিস। অন্যদের কথা জানি না, তারপরে বেশ ক'বছর ফকির সঙ্গ করে মনে হয়েছে ফকিরি গানের যে রহস্যাতীত মহা উপলব্ধির ভাবধারা তাতে নাচ ও বাদ্যযন্ত্রের ভূমিকা খুব গৌণ। গানবাজনা হারাম নয় বলে তার কট্টর মোল্লা-মৌলবিদের বিরুদ্ধে লড়লেও, দেখা যায় তাদের গানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার খুব কম। আর নাচ — সে অর্থে কোনো নাচই নয়। বসে বসে তারা গায়। যাবতীয় উল্লাসভঙ্গী শরীরের ঊর্ধাঙ্গেই। দাঁড়িয়ে গাইলেও কটিদেশ বা নিম্নাঙ্গ দুলবে না। ঊর্ধাঙ্গ ছন্দতরঙ্গে দুললেও তাতে থাকে ঘরানাগত উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্য। বিবাহহীন, সন্তানসন্ততিহীন, জন্মস্থান ও আত্মীয়পরিজনের পরিচয় দানে অনুৎসাহী ও সদাবিরত, যার আপাত-ঠিকানা খাজাবাবার দরগাসংলগ্ন যোলখাম্বা, সেই সুলতান ফকির থেকে বিবাহিত সন্তানসন্ততিময় বীরভূমের ফকিরডাঙ্গায় জালাল শা বা শাসপুরের আমিন শা সকলেই কমবেশী নাচ ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারবিধি নিয়ে একই উত্তরাধিকারের শরিক। পোশাকের ব্যাপারেও তারা ভ্রূপেক্ষহীন, দারিদ্রেও সমগোত্রীয়। অথচ এই চেতনারই আরেক শরিক বাউলরা নৃত্যমুখর চিরকাল। তবে এতো বাদ্যযন্ত্রমুখর ছিল না। সেগুলি ছিলো স্বকীয়তায় ভরা। নাচ ও বাদ্যযন্ত্র বাউল গানের মহিমাকে এক ভিন্ন পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়। পরম উপভোগ্য হয়ে ওঠে ব্যাপারটা। এর শিল্পসুষমা আজো আমাকে টানে। কিন্তু আজ কোথা সেই নাচ? সংখ্যায় সরল সেই বাদ্যযন্ত্র? দামী গেরুয়া আলখাল্লার উপর তাপ্পি, সৌখিন বাহারি মোড়ক। এরা কারা? ঐতিহ্যের দৃঢ় অবস্থান ছেড়ে তাদের নাচ আজ পণ্যদূষিত, আত্মীকরণহীন ধার করা আমদানীর ভেজালে সাধনাচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক মজা ও ফূর্তির উপাদানে পর্যবসিত। হরেক বাদ্যযন্ত্র ছাড়া তারা আর গানের কথা ভাবতে পারে না। দিনের পর দিন যার রকমারিত্ব বেড়েই চলেছে। স্টেজে আসার আগে সাজগোজ করতে তারা যে সময় নেয় তা প্রসাধনবাজীর চূড়ান্ত। এদের পেছন পেছন বাউলপ্রেমিক নামে হিন্দু মধ্যবিত্তের এক শহুরে বাউণ্ডুলে অংশ, গবেষক, মেম ও বিদেশে পাচার করার জন্য ফড়ে ঘুরছে। কুঁড়েঘর থেকে নিজেকে বিকিয়ে দালানে উঠছে বাউল। পরনে বিদেশি জিন্সের প্যান্টশার্ট, পাছার নিচে মোটরসাইকেল। খবরে কাগজে, রেডিও, টিভি, সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠান সর্বত্র এদের নিয়ে মাতামাতি। আমিও অনেক অনেক দিন হুজুগে পড়ে এদেরই খপ্পরে ঢুকে পড়েছি, এখন বেরুতে পারছি না। অথবা মন্দের ভালো হিসাবে হয়তো বেরুতেও চাইছি না।

কিন্তু ফকিরেরা যে-তিমিরে সেই তিমিরে। তাদের পেছনে কেউ নেই। পার্থিব আকাঙ্খা পূরণের লালসাজনিত বাণিজ্যিক আত্মপ্রতিষ্ঠা থেকে দূরে থাকে বলেই সর্বত্রই তারা অবহেলিত, এমনকি মূল্যায়নহীনও। মুসলিম মধ্যবিত্তের (?) রসিক-সাজা বাউণ্ডুলে বখাটে অংশও এদের পেছনে নেই। কিংবা হয়তো ওরা যে-আলোতে সেই আলোতেই। এই আলোকদর্শনের বড় প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল সুলতান আমেদের মুখোমুখি হওয়ার। নাচ ও বাদ্যযন্ত্রহীন গানেও যে আমি এত বেজে উঠতে পারি — দরকার ছিলো জানার, নিজেকে এভাবে খুঁজে পাওয়ার। আড়ম্বরের গোলক-ধাঁধায় ভাসছিলাম আমি, সঠিক দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুলতান আমেদ এক লহমায় আমাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে যেন বললে, 'চলো এবার, আর ভুল হবে না।' ফকির হোক, বাউল হোক, সেই থেকে আমি সুলতানদের খোঁজেই আছি। এই শাসপুরে, ফকিরের মসজিদে, আমি যে আজ পৌঁছতে পেরেছি — সে সুলতানমুখীনতা ছাড়া আর অন্য কিছু কি?

সন্ধ্যা হয়ে এলো। গোলাম শা এলো কই? না এলেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। কাজ শেষে সকলেই

মসজিদে। কতো যে আপন, কতো কাল চেনা। শুরু হলো গান। প্রায় সবই মহম্মদ শা-র গান। এরা ওর বায়েদ অর্থাৎ মুরীদ। অসামান্য তত্ত্বধর্মী সে-সব গান। বেশির ভাগই অজানা। আমি সংগ্রহ করে চলি। ফকিরদের নিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছি শুরুতেই, আলাপচারিতার সময়। গান শেষ হতে রাত নটা। এ সময় বাইরে কবর চত্বরে গিয়ে বসার অনুরোধ এলো। যারা মুরীদ নয় এমন কজন ও আমি ওখানে গিয়ে বসি। দরজা বন্ধ করে মসজিদের ভিতর শুরু হলো মুরীদদের গুরুনির্দেশিত ক্রিয়াকরণ ও সাধনা। আধঘন্টা পর খুলে গেল দরজা, ভিতরে ডাকা হল আমাদের। অনেকেই চলে গেল, রইলেন খাদিম ও তিন-চারজন লোক। আলোচনার উপযুক্ত সময় ও সুযোগ পেয়ে এবার আমি ফকিরিতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর গূঢ়রহস্য বিষয়ে কিছু কথা জানতে চাইলাম। আমার কথা সকলে মন নিয়ে শুনল, তারপর সব ফকিরের এক রা-এর মতো খাদিম বলে উঠলেন, 'আপনার গুরু ধরার সময় হয়ে গেছে। বায়েদ হয়ে যান, সব জানতে পারেন।'

বহুবার সন্দেহ হয়েছে — এটা এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র যা ব্যবহার করে বহু সেজে থাকা ফকির সাধু তাদের অজ্ঞানতাকে অন্যের কাছে ঢেকে রাখতে পারে। কিন্তু সকলেই তো তা নয়। তারাও যখন ঐ একই কথা বলেন, তখন ভাবি — আমার এই জানতে চাওয়া কি স্রেফ কৌতূহল? জেনে আমার কি হবে? আমি কি দেহে কায়েম করার জন্য ফকিরি সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করব? সর্বোপরি গুরু ধরব? আমার সদুত্তর জানা নেই। ফকিরেরা যদি অনধিকারী ভেবে আমার এই নিছক কৌতূহল মেটাতে না চায়, তাহলে ভুল তো কিছু করে না। এছাড়া উটকো ঝামেলা থেকে বাঁচবে এটা একটা রক্ষাকবচও। একবার পাথরচাপুড়ি মেলায় এক ফকিরকে ধরে বসেছিলাম, নানাভাবে চেষ্টা করেছিলাম মুখ খোলানোর জন্য। কিছুতেই কাজ হচ্ছিলো না। এদিকে আমিও মরীয়া। তাতে আভাসে ইঙ্গিতে ফকির এমন দু একটা কথা বলেছিলেন, আমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ঠিক কি বলছেন। একটু তফাতে চুপচাপ বসে অন্য একজন ফকির কথাগুলো শুনছিল। বেশ বয়স্ক, চুলদাড়ি সব শাদা। হতাশ হয়ে যখন উঠে চলে যাচ্ছি, বুড়ো ফকির আমাকে ডাকল। অনিচ্ছসত্ত্বেও তার কাছে গেলাম। কিছুক্ষণ অন্তর্ভেদী চোখে আমাকে দেখে বলল, 'শোনো বাবা, ফকির-বাউলের সঙ্গ কর সেটা কথাতেই টের পাচ্ছি। ভালো। তবে কি জানো, ভেতরের খবর সবাই জানে না, জানলেও দেবে না। দেওয়ার নির্দেশ নেই। বাইরে থেকে যা জানার অনেকেই জেনেছ — এরপর যদি জানতে চাও ফকির-বাউলের পেছন পেছন ঘুরে আর লাভ হবে না। গুরু ধর। মুরশীদ ছাড়া কোনোভাবে আসল ভেদ পাবে না।'

হাড়ে হাড়ে বুঝি আমি, কি খাঁটি কথা বলেছিলো ফকির। বাস্তবিকই আমি তো তেমন কিছুই জানি না। প্রশ্ন হয়, এই যে বাইরে থেকে এদের নিয়ে এতো গবেষণা, লেখালেখি ও পুস্তকপ্রকাশ, নানাদিক থেকে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়া সত্ত্বেও কোথাও এক বিশাল ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। একটা হল ফকিরিতত্ত্ব ও তাকে আয়ত্ব করার প্রয়োগসংক্রান্ত ক্রিয়াকরণ বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা। অন্যদিকে এটাই ফকিরদের যাবতীয় জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও চালচলনের মূলে — এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না। ভিন্ন ও প্রায় বিপরীত জায়গায় অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তির (গবেষকের) পক্ষে এগুলো যথার্থভাবে বোঝা ও মূল্যায়ণ করা প্রায় অসম্ভব। ফকিরডাঙ্গায়, আমি যেখানে আছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ধুলোময়লার মধ্যে খেলে, গড়াগড়ি খায়। একদিক আমি বউকে, যে কিনা ফকিরের মেয়ে, বলি, 'ছেলেমেয়েগুলো দিনরাত নোংরায় পড়ে আছে, মানা করতে পারো না? বউ বললে, 'তখন থেকে নোংরা নোংরা করছো — নোংরা কোথায়, ও তো ধূলো।' আমি অবাক। ধুলোকে নোংরা বলে চিনে এই সভ্যতার জন্ম, যেখানে আমি শিক্ষিত হয়েছি — সেই আমি অবাক। কে ঠিক? আমি না আমার বউ? আর আমি নিজেকে ঠিক বলে দাবী করতে গেলেও মনে হচ্ছে এর মধ্যে কোথাও ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। এ জন্যই কি পণ্ডিতদের টীকাভাষ্য পুস্তকে ফকিররা গুরুত্ব তো দিতে চায়ই না, উল্টে বিরোধিতা

করে? এমনকি শাস্ত্রকেও তারা গুরুত্ব দিতে নারাজ। কিন্তু এসব কথা ফকিরেরা নিজে লিখলেই তো ত্রুটিমুক্ত হত, ফাঁকিমুক্ত হত। তাও তারা লিখল না কেন? রাত বারোটা পর্যন্ত নানা কথাবার্তার পুর খাদিম মসজিদেই শুয়ে পড়েছেন। আমার ঘুম আসছিল না — এ কথাগুলো মনে ঘুরছিলো, প্রশ্ন করছিলাম নিজেকেই।

মনে হয় গুহ্য জিনিসকে অনেকাংশে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তারা। বিকাশশীল মহা অনন্তকে কোনো বিবৃতি ধাঁচে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন নি তারা, তাতে তত্ত্বের অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তারা ওপথ মাড়াননি, বলেছেন, 'দিলকেতাব' পড়ার কথা। লিখেছেন গান। এমন আভাসে ইঙ্গিতে লিখেছেন যাতে ব্যক্তর থেকে অব্যক্তই বেশি। এমনকি ব্যক্ত-ও হয়েছে অন্তহীন রহস্য মাখানো। আর সেই উপলব্ধিও এমন অতল গভীর যে সেই অজানা, অচিন বা অধরাকে আর অন্য কিভাবে ধরা যেতে পারে।

নিজের ব্যাখ্যায় নিজেরই হাসি পায়। নিজেকে এতসব গুহ্য রহস্য উন্মোচন করার লোক ঠাওরে হাসি ছাড়া আর কীইবা পেতে পারে। আমার এই কল্পিত সমাধানের মধ্যেও ফাঁকি নিশ্চয়ই কম নেই।

জালাল শা ফকির একবার বলেছিলেন, 'দিল-কোরআনই আসল কোরআন। এই কোরআনের মধ্যে যে বাতুন কোরআন তা অচিন অজানা অধরা — একমাত্র দিল-কোরআন পড়তে পারলে তা জানা যায়। এ জানার শেষ নেই। এবার যে যতোটা জেনে নিতে পারে।'

অনাধিকারী বলে ফকিরেরা তাদের ভিতরের কথা খুলে না বলুক, তাদের সঙ্গ আমাকে জীবনের বহু ফাঁকি ঘোচাতে সাহায্য করেছে। জালাল শা ফকিরের কথা মনে হতে একথাটা মনে এল। সাক্ষাৎকার নিয়ে নয়, ওতে আমার বিশ্বাস বড়ই কম, বরং দীর্ঘদিন মেলামেশা করে এবং চলাচল ও আচরণের উপর লক্ষ্য রেখে মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে জানার দিকেই আমার আগ্রহ। তা এই জালাল শা ফকিরকে যতো দেখি তত অবাক হই — সম্পত্তি নেই, মাটির ঘর, কারো কাছে হাত পাতেন না। অথচ মানুষের অযাচিত দানেই তার সংসার চলে। আর তাতে ঘুরিয়ে চলে মানুষেরই সেবা। যেখানেই থাকুন তিনি, যেখানেই যান, তার সঙ্গে পাঁচ-দশজন লোক জুটবেই; তিনি যা খান, তারাও তাই খাবে। যদি উপস্থিত সকলকে খাওয়ানোর পয়সা না থাকে, যত খিদে পাক নিজে একা কিছুতেই খাবেন না। কাউকে খাওয়াতেও বলবেন না। নিজে থেকে যদি কেউ খাওয়ায়, সে কথা ভিন্ন। এরপর আছে দিনরাতের যে-কোন সময়ে, এমন কি গভীর রাতেও, ভক্তদের নিয়ে বাড়ি ফেরা। ঘুম থেকে উঠে বৌ ও মেয়ে উনুন জ্বেলে রান্না চড়িয়েছে — ভাত খিচুড়ি যাই হোক, আছে মুরগীর মাংস — এ ঘটনা মাসে তিন-চারবার। উঠোনে তালাই পেতে ততক্ষণে শুরু হয়েছে গানবাজনা। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো জেগে উঠে ঘুম ঘুম চোখে এসে বসেছে আসরে। কেউবা গান শুনতে শুনতে ঢুলছে, কেউবা শুয়ে পড়েছে সেখানেই। ওদিকে দেখা যাচ্ছে ঝড়ে খড় উঠে যাওয়া ঘরের চাল, কিংবা ওড়েনি স্বাভাবিক নিয়মেই পচে গেছে — ছাওয়ানো দরকার। আশেপাশে একটিও ঘর নেই যার চালে নতুন খড় ওঠেনি, কিন্তু তার ঘর দিনের পর দিন ওরকমই পড়ে রয়েছে — বৃষ্টির জল পড়লেও ওরকমই পড়ে রয়েছে। কারণ আর কিছু নয় — বাঁশ খড় কেনার পয়সা নেই। এরমধ্যেই হয়তো হাতে টাকা এলে আসছে এক-দুই কেজি বড় মাছ। সে যতই আসুক — একবেলাতেই শেষ। দিনে এলে রাতে নেই। রাতে শুধু আলুসেদ্ধ আর ডাল। ঘরের জিনিস যত্রতত্র পড়ে — কারো লক্ষ্য নেই, মায়া তো নেই-ই। জালাল শা-ও ঘর থেকে বেরুলে কোথায় গেলেন, কখন ফিরবেন কেউ জানে না। ফেরা দেখতে পেলে ছেলেরা 'আব্বা, আব্বা' বলে ছুটতে ছুটতে যায়, তার সঙ্গে ফেরে। ফিরেই ফকিরি ঝুলি থেকে বের করেন ফলমূল বিস্কুট লজেন্স চানাচুর, যখন যা আনেন ছেলেমেয়েদের দেন। ছেলেমেয়েদের প্রতি তার প্রাণাধিক ভালোবাসা। অথচ ছেলেমেয়েগুলো ডানপিটে, কিছুটা জংলী এবং স্বাধীন। নিজেদের ইচ্ছেমত বেড়ে উঠেছে। এত ছোট বয়স থেকে এমন হস্তক্ষেপহীন স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ

আর কোথাও কোন ছেলেমেয়ে পায় কিনা জানা নেই। নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি মারমারিও লেগে আছে। অত্যন্ত বেয়াড়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, অথচ প্রতিটি ছেলেমেয়ের ভেতরটা অদ্ভুত নির্মল। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসায় শিশুরাও যে কতখানি এগিয়ে এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। একটু বড়রা দিনরাত মানুষকে জল এনে দিচ্ছে, চা এনে দিচ্ছে, ধুচ্ছে এঁটো কাপ গেলাস থালা — জাতপাতের প্রশ্ন নেই, চেনা-অচেনার প্রশ্ন নেই, অর্থবান-অর্থহীনের ভেদাভেদ নেই — সবার, সবারই। পয়সা না থাকলে আসছে না তরি-তরকারি, কিন্তু সেবার জন্য প্রতিদিন এক কেজি চিনি ও চা যে কীভাবে আসছে। সঞ্চয় না থাকার উদ্বেগও নেই। আজ হলেই হল — কাল কি হবে দেখা যাবে কাল। আজ কে ভাবে ও-সব কথা? কচ্চিৎ কখনো দু এক বেলা উপোস চলে গেলেও এ নিয়ম বদলায় না, আক্ষেপও নেই তার জন্য। আরো আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি ওই মানুষটি খোঁজ রাখছেন তার অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কেউ এলে ঠিকমত আপ্যায়ন পাচ্ছে কি না। একবার পায়নি জানতে পেরে বৌ-এর প্রতি তার সেকি মনোবেদনায় ভেঙে-পড়া আক্ষেপ ও চিৎকার (সামনে থাকায় যা আমার কানেও গিয়েছিল) — "আমি তো এনে দিচ্ছি, তোমাদের আনতে হচ্ছে না, তবু শুধু দিতে তোমাদের এত কষ্ট কেন? খেয়াল রাখবে — ওদের জিনিস ওরা খাচ্ছে। ওদের সেবার জন্য আমরাও দুটো পাচ্ছি। ওদের সেবায় যদি তোমাদের ভুল হয় তবে তোমাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, উপোসে মরবে - আমি শত চেষ্টা করেও তোমাদের খাবার জোটাতে পারব না।"

শিষ্টাচার ভালবাসা ও সেবার এমন আচরিত প্রাত্যাহিক সজাগ দৃষ্টান্ত জীবনে খুব একটা দেখিনি।

মনেপ্রাণে আমিও তো এই জীবন চাই। বিত্তের দাসত্বে মানসিকভাবে ডুবে থাকলে ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতার যে কী হীন আপোষমুখী আত্মকেন্দ্রিক চেহারা হয় — তা চারপাশে প্রত্যহ দেখছি। এই ফকিরের সৎ বেদনা প্রশ্নের কাছে বিস্মিত ও শ্রদ্ধানত আমার অবস্থান কোথায়? আমার জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষা, হায়, আমারই আকাঙ্খার সততাকে দমন করার কাজে লিপ্ত থেকে আমাকে বোঝাচ্ছে — যতই কাঙ্খিত হোক, এই নিরক্ষর ফকিরের পথে অতোটা হেঁটো না, মরে যাবে। না, ফকিরের ফাঁকি-ঘোচানো জীবনদৃষ্টান্তের আহ্বানে এগিয়ে গিয়ে উদ্ধার হবার যে ততখানি সামর্থ আমার নেই এই লজ্জায় আমার মাথা নিষ্কৃতিহীন হেঁট হয়ে আছে। এই ফাঁকিগুলো দেখতে দেখতে কখন মসজিদঘরে খাদিমের পাশে ঘুমিয়ে পড়ি।

তখনো সূর্য ওঠেনি। তবে চারিদিক বেশ ফরসা হয়ে এসেছে। ঘুব ভেঙে যায় আমার। আচ্ছন্নের মত উঠে বসি। মাথার মধ্যে রাতে দেখা স্বপ্নের দেশ। স্মৃতির পর্দায় রিপ্লে হতে থাকে খাসডাঙ্গালে গড়ে ওঠা গ্রামের ছবি, গৃহকর্তার ছেলের মুসলমানী, মৌলবির একনাগাড় ভাষণ, জালাল শা তালের শা-র সঙ্গে রাস্তার একপাশে দোকানে বসা, মৌলবি সম্বন্ধীয় তাঁদের নানা মন্তব্য এবং শেষে মৌলবির ভাষণ চুকে গেলে সেখানেই, সেই মৌলবি ও লোকজনদের মাঝেই, জালাল শা ও তালের শা-র একসঙ্গে গেয়ে ওঠা শুরুর সেই অভাবিত গান — যা গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক অপরিহার্য প্রতিবাদ হয়ে বেজে উঠেছিল —

"আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার ভিতরে
তিন গম্বুজ তিনটি সিঁড়ি ভিতরে তার খোদার ঘড়ি
রেখেছে নয় দরজা, ছয়জনা মৌলবি ফিরে
আল্লা কি মসজিদ .....
আওয়াল আখের দায়মে সোয়েম চাহারাম মশলা দিলে
পাপ নয়নে ধরে একি চুনকাম করিলে
আল্লা কি মসজিদ .....

ইমাম মেহদী তাতে নির্জনে নামাজ পড়ে
চৌদ্দ পোয়া হল খাড়া চার-ই মশলার জোরে
আল্লা কি মসজিদ .....
মায়ের চার বাপের চার দশ দিয়েছেন তিনি
আঠারো মকামের মসজিদ গড়েছেন সেই আপনি
আল্লা কি মসজিদ .....
দুদ্দু শা-র কহতবাণী অজুদ নামাজে শুনি
জ্ঞান পাপ গুণাগার কি করবে মন তসবি ধরে
আল্লা কি মসজিদ .....
দেহের মসজিদে নামাজ পড়লে রত্ন মিলে
সেই মসজিদের মতল্লি হয়ে থাকো তাহার মসজিদ আগলে
আল্লা কি মসজিদ .....''

গান চলাকালীন প্রতিবাদে প্রতিবাদে এত উন্মাদ, অচেনা হয়ে উঠেছিল ওই দুই ফকির — আর ততখানি বিভ্রান্ত অসহায় ও মুমুর্ষু হয়ে ঐ মৌলবি। পর পর অন্তরায় শেষে গানের কলিতে যখন ''ছয়জনা মৌলবি ফিরে'' কথাটি ফিরে ফিরে আসছিল — মৌলবির দিতে তাকানো যাচ্ছিল না সে সময়। ছয় রিপুর সঙ্গে মৌলবির তুলনা দিয়ে কোন গান মৌলবির পক্ষে নিরুপায় হজম করা প্রাণান্তকর। কিন্তু করারও কিছু নেই। যার একান্তে বশম্বদের মত মৌলবির ভাষণ চলাকালীন তটস্থ ছিল, সেই লোকগুলোই এখন স্বতস্ফূর্ত উন্মাদনায় ফকিরের গানে মেতে উঠেছে। ফকিরের গানে যে মসজিদের কথা ব্যক্ত হয়েছে সেটা শরার মসজিদ যেমন নয়, তেমনি এই ফকির-মসজিদও নয় — সেটা হচ্ছে এই মানবদেহ। এখানে মতল্লি হয়ে নামাজ পড়তে জানাটাই আসল, তবেই নামাজ হয়।

মনে পড়া এই স্বপ্ন-আচ্ছন্নতার ঘোরে আমি মুখ ধুই, চা খাই, তারপর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিই। কাঁধে ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষ বারের মত একবার দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাই, মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ফকিরদের উদ্দেশ্যে হাত মাথায় এনে সালাম জানাই। তারপর আবার হাঁটতে থাকি।

প্রথম প্রকাশ : গল্পসরণি/বসন্ত ১৪০৫/৩য় বর্ষ/বার্ষিক সম্মেলন

With best compliments from :

AMRIT BIO GROUP

- AMRIT PROJECTS LTD.
- AES AMRIT POWER PROJECTS PVT. LTD
- AMRIT BIO-ENERGY & INDUSTRIES LTD.

With Best Compliments

Since 1760
Lewis Berger
Paint your imagination

BERGER PAINTS INDIA LIMITED
Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700 017
Phone : 2229 9724-28, 2229 6005-06, Fax : 91-33-2249 9729/9009
www.bergerpaints.com

With best compliments from :

MADHABI *Traders*

Dealer of Raw Rubber & Rubber Chemicals
36, Chawl Patty Road, Kolkata - 700 010

Phone : 30913654 (O) 30921434 (R)
Mobile : 9830144007

With best compliments from :

JAI MATA DI

Transport Service Pvt. Ltd.

কী সন্ধানে যাই

— মৌসুমী ভৌমিক

সমস্ত টানের সূত্র খুঁজতে চাওয়ার অর্থ হয় না। হয়তো প্রথমে শুধু যাওয়াটাই থাকে। কিসের সন্ধানে যাই তা ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয়, আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরূপও পাল্টে পাল্টে যায়। আজ মনে হয় এই জন্য যাই, কাল আর কিছু মনে হয়।

২০০৪ সালের ৬ই অক্টোবর কলকাতা শহরে সারা রাত বৃষ্টি পড়ছিল। সাত তারিখ ভোরে সুকান্ত যখন আমাকে স্টেশনে যাবার জন্য নিতে আসে, তখন প্রায় দেড় ফুট জল ডিঙিয়ে আমি ট্যাক্সিতে উঠি। আমরা রামপুরহাট যাবো, সেখান থেকে তারাপীঠ, কানাই এর কাছে। মাস কয়েক আগে আমি একলা একবার গিয়েছিলাম। কানাইদা সেদিন ছিলেন না, কলকাতায় এসেছিলেন গলার চিকিৎসা করাতে। মন্দির চত্বরে ফুল আর ধূপের দোকানের লোকেরা বলেছিল, কানাই তো আর গান গাইতে পারছে না।

তারপর ওইদিন সারা শহরে দেখি জল, স্টেশনে মানুষজন কম। আর ট্রেনেও ইচ্ছে মতন জানালার সীট পাওয়া যাচ্ছে। ট্রেন যতই বোলপুর পেরিয়ে এগোয় ততই চুপচুপে ভিজে দেখায় চারপাশ। আমি আর সুকান্ত পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। তারপর সাঁইথিয়ায় ময়ূরাক্ষী পেরোনোর পর বৃষ্টির সত্যিকারের মাত্রাটা ধরা পড়ে আমাদের চোখে। যাবো কি আর? ভাবি কথাটা, তবু যাই। রামপুরহাটে অটোওয়ালারা বলে সবটা পথ গাড়ি যাচ্ছে না, খানিক পরে ট্রলিতে উঠতে হবে। কি জানি আমরা ওদের সব কথা বুঝতে পারি কি না? কারণ তাহলে তো আমরা আর এগোতাম না। অটো যেখানে নামিয়ে দেয় তার সামনে পাকা রাস্তা আর দু'পাশের মাঠঘাট সব নদী হয়ে গেছে। তাতে খরস্রোত জল বইছে। তারপরেও আমি গবেষক আর সুকান্ত রেকর্ডিস্ট ভ্যানরিক্সায় চেপে বসি। ভ্যান ভেলা হয়ে টলমল করে। আমি বাবু হয়ে বসে টের পাই পাটাতনটা জলের তলায় চলে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। রেকর্ডিং যন্ত্রের ব্যাগটা আমি উঁচু করে ধরে থাকি আর আস্তে আস্তে বলি, সুকান্ত, আমি কিন্তু সাঁতার জানি না। বলে হেসে ফেলি। সুকান্তও হাসে। আমরা তখন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে IFA (মানে, যারা আমাকে এই বাংলা লোকগানে বিরহ নিয়ে কাজ করার জন্য গ্রান্ট দিয়েছে) নিশ্চয় এমন নিষ্ঠার সঙ্গে কিন্তু ওয়ার্ক করার জন্য আমাদের একটা সোনার মেডেল দেবে।

দু'পাশে, সামনে পিছনে আরও ভ্যানরিক্সা, জল টেনে, সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর কাজ। আমাদের ঠিক সামনেই নীল প্লাস্টিকে ঢাকা একটা ভ্যান, তার এক কোণে একজন বসে, কানে আসে 'বল হরি, হরি বোল' ধ্বনি। আমি ভাবি, এমনই বুঝি এখানকার রীতি। বিপর্যয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এমন করেই রঙ্গ করে মানুষ। সবই মড়া কাঁঠে চলার মতন। তারপর হঠাৎ টের পাই রঙ্গ নয়। নীল প্লাস্টিকের তলায় একটি লাশ আছে এবং আমরা সবাই এখন শ্মশানযাত্রীতে পরিণত। জলের স্রোতে খই ছড়াচ্ছে কেউ।

তারপর কানাইদার সঙ্গে দেখা হয়। শ্মশান মন্দিরের বেশিটাই জলের তলে ডুবে গেছে। আমরা সিঁড়ির উপরে বসে কথা বলি। কানাইদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, আমি দু'একটা প্রশ্ন করি। কানাইদা উত্তর দেন, সুকান্ত রেকর্ড করে।

'আমি পুকুরের জলে গলা ডুবিয়ে গান গাইতাম আর আমায় লোকে বলতো তুই গানটাই গা।'

'কী গান?'

'ওই, যা শুনতাম চারপাশে। ছায়াছবি হরিনাম। আমার একটা দাদা ছিল। পিসতুতো দাদা, সে একটা গান দিয়েছিল আমাকে : গৌরলীলার বাজারে অবাক যাই হেরে। বলেছিল, তুই এই গানটা শিখে নে। তোর বাবা মা মরে গেলে তোকে দেখবে কে? তুই অন্ধ মানুষ। সেই থেকে গান শেখা আমার। মনে হতো, কতই তো অন্ধ খোঁড়া লোক আছে চারপাশে তাদের কে দেখে? আমকে কিছু একটা করে বড় হতে হবে।'

'আর বাউল হওয়া? কেমন করে হয় বাউল?'

'কী জানি? বাউল কি আর অত সহজে হওয়া যায়? আমি কিছু সাধুর সঙ্গ করেছি মাত্র। গান গাইতে পারতাম, তখন প্রায় টেপরেকর্ডের মতো ছিলাম। যা শুনতাম, তাই গেয়ে ফেলতাম। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। বাউল কে হয় কে জানে? বাউল কি আর চোখে দেখা যায়?'

সেদিন ওই কথাটুকুই হয়েছিল, গানের জন্য আর থাকিনি আমরা। আমার ভয় করছিল, মনে হচ্ছিল জল এখন শুধু বাড়তেই থাকবে। একদিন দু'দিন ধরে। মড়া পোড়ানো যাবে না। আর তখন সেই মড়াগুলোর কী হবে? আর আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না। এত জল চারদিকে, কীভাবে যে ফিরবো? সুকান্ত একটা গাড়ির খোঁজ করতে গেল, আমি পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখি ওদিক থেকে একজন আসছে, কুঁজো মতন, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। কাছে আসতে দেখি কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ। হাসি হাসি মুখে সে বলতে বলতে চলেছে। ভাসছে। ভাসছে। বলতে বলতে পার হয়ে গেল।

পরের সপ্তাহে আমরা আবার ফিরে গিয়েছিলাম বানাইদার কাছে। তখন জল নেমে গেছে। ওঁর বাড়ির বারান্দায় বসে সকালবেলায় গান হয়েছিল — রামপ্রসাদী, বিজয় সরকার, কীর্তন, লালন, মুর্শিদী গান। কানাইদার বৌ পাশেই উনুনে রান্না চড়িয়েছেন। আমরা উঠবো বলাতে বললেন, সে কি, অন্ন গ্রহণ না করেই যাবে? আমরা বললাম, আর একদিন খাবো। বললাম, আপনি আর একটা গান শোনান। তারপর আমরা যাই। তো, কানাইদা গাইলেন : 'কৃষ্ণকথা শুনতে লাগে ভাল। বল গো সই আবার বল।' মনে হল বিজয় সরকারের এই গানটা দিয়ে যেন যথাযথ সমাপ্তি হল সেদিনের আসরের। কানাইদার 'কৃষ্ণকথা' দিয়ে।

এই যে মনে হওয়া, যা শুনি, দেখি। তা দেখে এর একটা কথা মনে হয়। সেই মনে হওয়া দিয়েই পরে আমরা আমাদের গল্পগুলোকে সাজিয়ে তুলি। রঞ্জন পালিতের 'অবাক যাই হেরে' ছবিতে কানাইদা বলেছিলেন : 'এই শ্মশানের ঘ্রাণ। এছাড়া থাকতে পারি না। এর মধ্যে একটা আলাদা জীবন আছে।' 'ঘ্রাণ' - ছবির শেষে শব্দটা বাজতে থাকে আমার কানে। তার কোনো বিশেষ অর্থ করি আমি।

দীপক মজুমদারের 'ছুটি' পড়তে পড়তে আমার রঞ্জনের ছবির কথা মনে পড়ছিল। 'অনর্গল জোনাকির মতো ভাসতে থাকা নানা আন্তরিক পর্দায় মা, মা-গো, জয় ত্তারা ধ্বনি। মাতৃজঠরের আলো-আঁধারি জুড়ে কিছু মানুষ-শিশু। পুরুষ ও নারী — ঈষৎ আলোর আভা থাকলে যাদের ছায়ার মতো অপ্রতিভ দেখায় আর উদ্ভট অন্ধকার ঘিরে ধরলে যারা বিধাতার উজ্জ্বলতা পায় — তা সে মাতাল, চ্যাংড়া, ধনী, দুঃখী, পাগল, ব্যবসাদার, উদ্‌ভ্রান্ত, বেশ্যা, স্তিতধী, অবধূত, পুলিশ, কবি, ভিখারিণী, গৃহস্থ, ওয়াগন-ব্রেকার, ভক্ত বা শয়তান, যেই হোক না কেন। গাছের তুলায় ফোকরে ফোকরে ধুনি জ্বালিয়ে বসে তন্ত্রসাধক, কারো চারপাশে নিত্যসঙ্গী নরকরোটির সারি, কেউ বা যন্ত্র ও মন্ত্রে আসীন। মহাশ্মশানের আঁকাবাঁকা পথের দু'পাশে পাখির বাসার মতো জমাট এইসব আখড়া। ভোগ পরিবেশিত হল। তরুণ তন্ত্রাভিলাষী অন্ন ভাগ করে খাচ্ছেন দু'তিনটে ভক্ত কুকুরের সঙ্গে একই পাতায়। আলুথালু বেশ জাগ্রতচিত্ত এক নারীকে মাঝে মাঝেই এমনভাবে ডুকরে কেঁদে উঠতে দেখা গেল . . .।'

আমি দেখেছিলাম, বাংলাদেশের ফরিদপুর শহর থেকে দূরে। ম্যাম্বার গেট্টি নামের একটি গ্রামের এক রাতের মিলাদ অনুষ্ঠানে আর এক অন্ধ, ইব্রাহিম, কান্ডারী হয়ে মিলাদ পরিচালনা করছিলেন যেন জড়ো হওয়া ভক্তদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন এই বলে যে, চলো, এই তিমিরের ভিতর দিয়ে আমরা নৌকা বয়ে নিয়ে যাই। বলো, আল্‌লা, আল্‌লা, আল্‌লা আল্‌লা। তালে তালে বৈঠা পড়ছিল জলের উপরে। আর সেই নৌকায় আর এক আলুথালু-বেশ নারী। তার ভর হয়েছিল বুঝি। শীতের সেই রাতে সে মাটিতে মাথা ঠোকাচ্ছিল, আবার উঠে বসছিল। জিকিরের তালে তালে। আল্‌লা, আল্‌লা, আল্‌লা, আল্‌লা . . . . .

এক একটা মূহুর্তের উপর এমন সব অর্থ আমরাই আরোপ করি। যা শুনি, দেখি, তা নিজের মতন করে বুঝি, বোঝাই। এই আমাদের গল্প বলা। আর এমন সব মুহুর্তের জন্ম হবে বলেই আমাদের আসরে, মিলাদে, মেলায়, মেহ্‌ফিলে আসা। সেই মেলা শিল্পী আর শ্রোতার মেলা, উভয়ের সংযোগে তার সৃষ্টি। গৌরক্ষেপা গৌর বলেই অমন করে গান করেন। আর দীপক, দীপকের চোখ আর মন দিয়ে দেখেন 'বীরভূমের নাগার্জুন-প্রতম' গৌরক্ষেপাকে যে 'তারাপীঠের মহাশ্মশানের তীব্র উন্মাদ অনুরাগে, নির্দিষ্ট কুম্ভক-পাকের মোচড়ে, ঝাঁকড়া-সজাগ মাথাভর্ত্তি চুল চামরের ছন্দে, মেরুদণ্ডের হাত দুলিয়ে, খমকের সটান তীক্ষ্ণতায়, দু'পায়ের আকস্মিক বজ্রযানী লাসে, মর্মপ্লাবী দু'চোখের ভাসমানতায়, ঠোঁটের অনাথ-চড়ুই উদ্বেগে . . . . ঘটিয়ে তুলছিল এমন এক আত্মনিবেদনের জগৎ, এমন এক বিস্ফোরণেরও ছবি, যার কোন সংজ্ঞা হয় না, কোন তুলনার আলিঙ্গনে যকে বাঁধা যায় না, চল্লিশ মিনিটের যে ব্রতচারণ মানুষকে ডেকে নেয় এক ভ্রূণাকুল সৌন্দর্য-সাঁতারে।'

এতখানি সবাই দেখতে পায় না অবশ্যই। যেমন দীপকের দেখা। কিন্তু টানটা অনুভব করে তার নিজের মতন করে। ১৯৩২ সালে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ আর্নল্ড আদ্রিয়ান থাকে কেন্দুলিতে অচিন্ত্যদাসীর নামের এক শিল্পীর গান রেকর্ড করেছিলেন মোমের সিলিন্ডারে। সেই রেকর্ডিং সম্পর্কে যে নোটটি পাওয়া যায়। তা সংক্ষিপ্ত। কিন্তু বাকে যখন নাকি বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন, তখন কথার সঙ্গে গানও গাইতেন। কারণ বাকে নিজে একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। অতএব অচিন্ত্যদাসীর সুর হয়তো বাকের কণ্ঠে কোথাও স্থান করে নিয়েছিল।

লণ্ডনে বড় হয়েছে রঙ্গন মোমেন। বাবা মা'র বাড়ি এই পশ্চিমবাংলায়। পার্টিশন, চাকরী ইত্যাদির সূত্র ধরে বাংলা হয়ে ওরা নিয়ে পৌঁছয় লণ্ডনে। রঙ্গন কৈশোর শেষে দেশ দেখতে আসে আর কোনো এক অমোঘ টানে বাঁধা পড়ে যায় এই বাউল ফকির জীবনের সঙ্গে। রঙ্গন নিজেকে Compulsive Collector বলে, যেন গান সংগ্রহ না করলে ওর চলে না। এক সময় কালো মানুষদের গান reggae সংগ্রহ করতো। তারপর বাউল-ফকিরি গান। আমি অনেক গান, অনেক নাম শুনেছি, শিখেছি রঙ্গনের কাছে। বীরভূমের, কুষ্ঠিয়ার অনেক শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছি রঙ্গনের বন্ধু বলে। রঙ্গন বলে এই গান সংগ্রহ ওর 'সাধনা' যেমন সংগ্রাহক দেবেন ভট্টাচার্য্যের ছিল। রঙ্গন গুরু বলে মানতো ভাস্করদাকেও। ওই দূরদেশে থেকে মনটাকে লালন করতে শিখেছে যে রঙ্গন তা এমন মানুষদের ছায়া পেয়েছে বলেই।

আর এক রকমের সাধনা দেখি জান ওপেনক্ষর মধ্যে। যিনি গত তিরিশ বছর ধরে ফিরে ফিরে আসছেন বীরভূমে, বাউল সাধনার জগৎটাকে বুঝবেন বলে। জানি তার নিজের মতন করে একটা জগৎকে

নির্মাণ করেছেন, তার দেখা-শোনা-বোঝা দিয়ে। সংসারের টান আর মুক্তি-চাওয়া-মন তাঁকে ভাবায়, সংসারের ভিতরে থেকেই মুক্তির সাধনা সম্ভব কি না জান তার অনুসন্ধান করেন। তেমনই আমি বুঝেছিলাম জানের সঙ্গে কথা বলার সময়। আমায় যত না ওর Seeking Bauls in Bengal বইটি টেনেছে, তার চেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছেন জান নিজে, নাড়া দিয়েছে ওর এই বার বার ফিরে আসা।

একবার একটি ইন্টারভিউ-এ গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি কখনো কোনো বড় রেকর্ড লেবল-এর কাছে যাবেন না। কারণ মহিনের ঘোড়াগুলি was all about subversion। সাবভার্সন শব্দটার জুতসই বাংলা খুঁজে পাই না। তবে মনে হয় যে এই সাবভার্সনের অর্থ এক ধরনের মুক্তমন নিয়ে চলাও বটে। হয়তো সেই জায়গা থেকেই গৌতম বাউল ফকিরি গানের প্রতি একটা বিশেষ টান অনুভব করতেন। এই গানের সঙ্গ করার ফলেই হয়তো তার কিছু কিছু চিহ্ন লেখা হয়ে গিয়েছিল মহিনের ঘোড়াগুলির গায়ে।

সংযোগের, মিলনের চিহ্নগুলি আসলে দুই তরফের জীবনেই লেখা হয়ে যায়। যেমন গৌতমের কণ্ঠে এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ হয়তো গৌর অবস্থান করতে পারতেন, তেমনি মেলা থেকে শহরের পথ, আকাশচেরা জেটরেখা থেকে পোল্যাণ্ড উডস্টকের অলিগলি এক অন্য মানচিত্রের কনট্যুর লাইন দেখা দিতে পারে বীরভূম-নদীয়া-যশেঅর-ফরিদপুরের বাউল ফকিরের গায়ে। ষাটের দশকে অ্যালান গিন্সবার্গ কলকাতা থেকে ঘুরে গিয়ে উডস্টকের অ্যালবার্ট গ্রসমান এবং ম্যালি গ্রসমানকে বলেন পূর্ণদাসের কথা। গসমানরা আসেন কলকাতায় এবং তার পরিণাম ১৯৭৬ সালে উডস্টকে বিগ পিংক নামের একটি স্টুডিও বাড়িতে পূর্ণদাস, সধানন্দ দাস এবং লক্ষণ দাসের রেকর্ডিং। Bengal Bauls at the Big Pink অ্যালবামটি যত্ন করে রেকর্ড করিয়েছিলেন The Band নামের Rock' n' Roll ব্যাণ্ডের গার্থ হাডসন। The Band-এর ড্রামার লেভন হেল্‌ম্ ওঁর The Wheel's on Fire বই-এ লেখেন।

'. . .we invited 'em to Big Pink one night. The Bauls had long black hair braided to the waist and were wearing cowboy hats they'd picked up on the drive east from California, where they'd arrived direct from Bengal.
(Before heading east in a beat-up old van, they'd played the Fillmore West on a bill with the Byrds.) They loved the bubbling beer sign over our fireplace, and I played checkers with some of 'em, and we were laughing pretty hard. I was smoking a chillum with Luxman Das, and I said, "Man, that's some good weed." He smiled and said, "Very good, but nothing like my father used to smoke - little hashish, little tobacco, little head of snake."
I said, "Wait a minute. Did you say 'snake head'?"
And Luxman laughed. "Yes, by golly! Chop off head of snake, chop into tiny pieces, put in chillum with little hash, little tobacco. Oh, boy! Very good - first class high!"
"Snake?" I pressed him. "Are you sure you mean snake?"
Now they're all laughing. "Yes! Very good! Head of snake!". . .
Everybody around Woodstock in those days loved the Bauls. They were close to the bone of what music should be all about: ecstatic, unrelenting. They told us they loved Woodstock too because there was all this forest and no tigers to eat the children and goats. Their presence can best be felt if you look at the photo of two of them - the brothers Luxman and Purna Das - posing with Bob Dylan on the cover of his new album, which came out the following month - "John Wesley Harding".'

এইভাবে এক একটা গানের জগৎ নির্মাণ হয়ে যায় এক এক ধরনের শ্রোতার সামনে। নির্মাণ আমরা সবাই করি। ইমেজ তৈরি করি, নিজের এবং অপরের। রুচির যোশির ছবি 'এগারো মাইল'-এ পবন 'তুই আমারে পাগল করলি রে' গায় রাজপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে; মাল-বোঝাই ঠেলাগাড়ি, সিনেমার হোর্ডিং, এমনকি একটা গরুর গাড়িও গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় কলকাতার বুকের উপর দিয়ে। রব ডিলান তাঁর John Wesley Harding অ্যালবামের প্রচ্ছদের জন্য পূর্ণদাস, লক্ষ্মণদাস এবং গ্রসমানদের বাগানে কর্মরত এক কাঠের মিস্তিরিকে সঙ্গে নিয়ে তোলেন, কারণ তিনি ওই 'real people'-এর ইমেজটাকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এতে ডিলানের এক ধরণের ইমেজ তৈরি হয়। পূর্ণদাসের আর এক ধরণের।

দীপক মজুমদারের মনে হয়েছিল এই যাওয়া-আসার ফলে কোথায় যেন গৌর-পবনের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা নিয়ে যায় তাদের আরো দায়িত্বশীল হওয়া উচিত ছিল, দীপক রুচিরকে বলেছিলেন 'এগারো মাইল'-এ। কারণ দুই পৃথিবীর ছন্দ নয়, বলন-চলন এত ভিন্ন। তারপর ওরা ফিরে এসে আর ফিরতে পারে না। হরি খুব কষ্ট পেতো গৌর চলে গেলে, দীপক বলেছিলেন।

কিন্তু, কেমনতর দায়িত্ব পালনের কথা বলেছিলেন দীপক? যে, খেয়াল রাখতে হবে, যাকে নিয়ে যাচ্ছি, সে যেন তার পুরনো জীবনে ফিরে যেতে পারে? কিন্তু তা কি সম্ভব? একবার যাবার পর সেই একই জায়গায় ফেরা যায় কি আর? জর্জ লুনোর ছবিতে কার্তিক তখন ছোট ছেলে, তাকে জর্জ আর ভাস্কর একভাবে নির্মাণ করলেন। ছবির স্বার্থেই ওই নির্মাণ। কিন্তু 'এগারো মাইল'-এ কার্তিক বলেছে ওই ছবিই কিছুটা তাকে এই পরবর্তী বাউল জীবনের দিকে ঠেলে দেয়। আজকের 'দেখে যা রে মাঝভাঙারি'র কার্তিক আর নিজস্ব নির্মাণ।

এই ভাঙাগড়া চলতেই থাকে। তাকে ঠেকানো কেমন করে? আজ এই নবনগর - বিবেকানন্দ ময়দানে (শক্তিগড়ের) মেলা বসে। কাল হয়তো আর কোথাও সরে যাবে মেলা। অথবা আর হবেই না। আরো অনেকদিন পর হয়তো মাঠ ভরা উঁচু বাড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে পড়বে এইখানে একদিন সকালবেলায়, কণ্ঠে আশ্চর্য মায়া মেখে, কানাই গেয়েছিলেন 'আমি তোমায় ভজে সব হারালাম, হলাম পথের ভিখারী।/আমার ধন কূলমান, জীবন যৌবন, সব কিছু নিল হরি।'

With best compliments from :

Top up!

Buy a 270gm pack of Bisk Farm THE TOP and get an extra 50gm, absolutely free!

BISK FARM
BISCUITS

With best compliments from :

M/s. ADUNIQUE 76

P-29, C. I. T. ROAD
KOLKATA - 700 014

With best compliments from :

A

Well

Wisher

With best compliments from :

Montaggio

Non linear digital Set-up

&

A house of Audio-visual Production unit

Contact :

Debashis : 9831082851

Tapas : 9836070182

17/19, K. P. Roy Lane, Ganguli Pukur, Dhakuria, Kolkata - 700 031

MARFAT
13/A Raipur Road East, Flat 6, Kolkata 700 032
Phone # 033 2414 3112, 94335 01217
Email : marfat_india@hotmail.com

CENTURYPLY®

sab sahe
mast rahe

sms 'PLY' to 54646 for any query